প্রতিবিম্ব

শারদ স্মরণিকা-২০২৩

মডার্ণ ক্লাব

ভট্টপুকুর, আগরতলা

Our Services

- Fall Ceiling
- Modular Kitchen
- Furniture
- Colour Combination
- POP Design
- Aluminium Work
- Steel Railing
- Wallpaper
- Exc

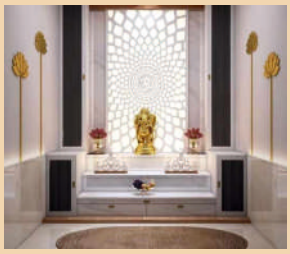

Sunshine Interiors

9366037927/ 9362669684

প্রতিবিম্ব
২০২৩(১৪৩০ বাংলা)

মডার্ণ ক্লাব

ভট্টপুকুর, আগরতলা

প্রচ্ছদ পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় 'চারবাংলা মন্দির'। এর গায়ে রয়েছে পোড়া মাটির কাজ, যা শুধু বাংলার নয়, সারা পৃথিবীর একটি সেরা পোড়ামাটির কাজ বলে বিবেচিত হয়। এর দেয়ালে থাকা দেবী দুর্গার মূর্তিটি ওখানকার অন্যতম আকর্ষণ। মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী নদীর পাড়ে আজিমগঞ্জের বড়ানগরে চারটি মন্দিরে বেষ্টিত 'চারবাংলা মন্দির'। মন্দির চত্বরে প্রবেশের ঠিক আগে শিবের ভবানীশ্বর মন্দির। ১৭৫৫-১৭৬০ সালে রানি ভবানীর পৃষ্ঠপোষকতায় চারবাংলা মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এটি বাংলার সেরা শোভাময় ইটের কাজের একটি উদাহরণ। রানি ভবানী একজন ধার্মিক মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবান শিবের অনুগত ভক্ত। তাই তিনি শিবকে উৎসর্গ করে সমস্ত মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের দেয়ালগুলি টেরাকোটার চমৎকার শিল্পকর্মের উদাহরণ। যা হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিগুলিকে নিজস্ব একটি অনন্য শৈলীতে প্রতিফলিত করে। প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প ও ইতিহাসে আগ্রহী বিশ্ব পর্যটকদের জন্য এটি বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান। 'চারবাংলা মন্দির' এর গায়ে থাকা পোড়ামাটির তৈরি দেবী দুর্গার ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিনন্দন মূর্তির **এই ছবিটি তুলেছেন স্বনামধন্য ফটোগ্রাফার, বতর্মানে আমেরিকা নিবাসী আগরতলার ডা: স্বপন চৌধুরী।**

"Pratibimba"
.... Saradiya Smaranika - 2023
Modern Club, Bhattapukur, Agartala, Tripura(West)

'প্রতিবিম্ব' শারদ স্মরণিকা কমিটি

শারদ স্মরণিকা কমিটির সদস্যবৃন্দ

শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
শ্রী পার্থ চক্রবর্তী
শ্রী চন্দন কর
ডা: মণিদীপ চক্রবর্তী
শ্রী দেবব্রত ভৌমিক
শ্রী সুব্রত ভৌমিক
শ্রী পার্শ্বনাথ ধর
শ্রী মিন্টু দেব
শ্রী তাপস ভদ্র
শ্রী সুজিত পাল
শ্রী দেবারুণ দত্ত
শ্রী ধৃতিমান চক্রবর্তী
শ্রী নিতাই পাল

সম্পাদক
পার্থসারথি দেব

শারদ স্মরণিকা উপদেষ্টা কমিটি

শ্রী মিহির চক্রবর্তী
শ্রী মৃণাল কান্তি দেবরায়
শ্রী সময় রায়
শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী শেখর সি দত্ত
শ্রী আশিস রায়
শ্রী স্বপন দত্ত
শ্রী স্বরাজ দেব
শ্রী হিমাদ্রি সাহা
শ্রী রতন দেব
শ্রীমতি জবা চৌধুরী
ডা: বাসুদেব রায়
ডা: অপরাজিতা পাল
শ্রী সঞ্জিত নাহা (লিটন) - ক্লাব সম্পাদক
শ্রী দেবজিৎ বিশ্বাস- পূজা কমিটির সভাপতি
শ্রী আশিস দেব- পূজা কমিটির সম্পাদক
শ্রী সুব্রত সাহা
শ্রী জয়ন্ত পাল
শ্রীমতি মিতা চক্রবর্তী

ছাপক নিঃ
অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রিন্ট, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা
ফোনঃ ৯০৮৯৭২২১৯৯/৯৮৬২৪৭০২৯৫

सत्यमेव जयते

ত্রিপুরা সরকার

মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও আগরতলার ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ণ ক্লাবের শারদ স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্প ও সাহিত্যের মেলবন্ধন নিঃসন্দেহে আমাদের ঐতিহ্যকেই সমৃদ্ধ করে।

সার্বজনীন শারদোৎসব সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একাত্ম করে তুলে। ধর্মীয় পরিমন্ডলের মাধ্যমে গড়ে উঠে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ। উৎসব আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্পসংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার নতুন প্রজন্মকে সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত করে।

শারদোৎসব আয়োজনের পাশাপাশি ক্লাব এলাকায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, রক্তদান এবং নেশার বিরুদ্ধে জন সচেতনতা গড়ে তোলাসহ সামাজিক কাজে ক্লাবসমূহের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শারদ উৎসব আনন্দমুখর হোক এবং সকলের জন্য সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসুক।

প্রফেসর ডা: মানিক সাহা
মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

মেয়র
আগরতলা পুর নিগম

শুভেচ্ছা

এটা আনন্দের যে, শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মডার্ণ ক্লাব সামাজিক সংস্থা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আয়োজন করছে। পাশাপাশি প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও 'প্রতিবিম্ব' স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। যেকোন সামাজিক সংস্থার প্রথম এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো সমাজের সেবামূলক কাজে ব্রতী হওয়া। এই পূজা অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে মডার্ণ ক্লাব সামাজিক সংস্থার এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া প্রশংসনীয় বিষয়। আশা রাখি প্রতিভাবান লেখকদের লেখায় স্মারণিকাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

আমি স্মারণিকাটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং প্রত্যাশা রাখছি সংস্থার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা সকল কর্মসূচি সুন্দরভাবে সফল হবে।

দীপক মজুমদার

কর্পোরেটর
আগরতলা পুর নিগম
৪০ নং ওয়ার্ড

শুভেচ্ছা

শারদোৎসব বাঙালি জাতির এক অন্যতম মহামিলনের উৎসব। সকল জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে বাঙালির শারদ উৎসব এক অন্যতম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহন করে।

শিউলির সুবাস আর কাশফুল জানান দেয় শারদোৎসবের আগমন বার্তা। আমার বিশ্বাস মা দুর্গার আশীর্বাদে ৪০ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণে আমরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তথা সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গঠন করতে সক্ষম হব।

শারদোৎসব উপলক্ষ্যে মডার্ণ ক্লাব শারদ সংকলন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই সংকলনের সফলতা কামনা করি।

আমি মডার্ণ ক্লাব কর্তৃপক্ষসহ এলাকার প্রত্যেক সুনাগরিককেই শারদ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

Sampa Sarkar (Chowdhuri)

সম্পা সরকার (চৌধুরী)

চেয়ারম্যান
দক্ষিণ জোন, আগরতলা পুর নিগম

শুভেচ্ছা

কাশবনের দোলায় দেবীপক্ষের সূচনা বাঙালির মনকে আলোড়িত করে। বাঙালির দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে মহালয়ার শুভ বন্দনাতে। শরৎ এর মেঘ ও শিউলির গন্ধ দশভুজার আগমনকে উন্মুক্ত চিত্তে স্বাগত জানায়। তাই আসুন উৎসবের এই দিনে শুদ্ধ চিত্তে পরিচ্ছন্নতার আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দিই সকলের মননে। পরিচ্ছন্নতায় এবং পবিত্রতায় হোক পূজা উদযাপন।

আমি খুবই আনন্দিত প্রত্যেক বছরের ন্যায় এইবারও শহর দক্ষিণাঞ্চলের বহু প্রাচীন এবং সুনামধন্য ক্লাব "মজার্ণ ক্লাব" মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাদের প্রতি রইলো আমার অফুরন্ত ভালোবাসা, শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছাসহ,

অভিজিৎ মৌলিক

ক্লাব সভাপতির শুভেচ্ছা

সবার জন্য রইল শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তেজোময়ী ত্রিনয়নী দশভুজার আগমনে রাজ্যবাসী মেতে উঠেছেন আনন্দ উৎসবে। মডার্ণ ক্লাব আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে মায়ের আরাধনায় ও শারদ স্মরনিকা **'প্রতিবিম্ব'** প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছে।

বর্তমান সময়ে আমাদের দিশা ও প্রয়াস হচ্ছে—ছাত্র-যুব সমাজকে ধ্বংসাত্মক-মারাত্মক নেশার কবল থেকে মুক্ত করা। এই বিষয়ে যুব সম্প্রদায়কে ও তাদের অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন। আমরা প্রশাসনকে সহযোগিতা করবো। মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা "মা" যেন আমাদের এই দিশাতে এগিয়ে যেতে শক্তি ও সাহস দেন।

মায়ের আগমনে চলুন আমরা সবাই মিলে সমাজকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলতে ঐক্যবদ্ধ কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, স্বচ্ছ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুন। পুজোর দিনগুলো আপনাদের আনন্দে ভরপুর থাকুক। সকলের জীবন মঙ্গলময় হোক— এই কামনা করছি মায়ের কাছে।

সজল চক্রবর্তী
সভাপতি
মডার্ণ ক্লাব

ক্লাব সম্পাদকের বার্তা

শিউলি ঝরা আঙিনা, ফুটে আছে পদ্মফুল। কাশফুল জানান দিচ্ছে শরৎকাল এসে গেছে। শরতের সবুজ স্পর্শে, আকাশে সাদা রঙের ভেলা, শরৎ শুভ্র হাওয়া মায়ের আগমনীবার্তায় প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলেছে। মিতালি ভালোবাসার স্পর্শে কিছু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, অণুগল্পে, সৃজনশিল্পীর উষ্ণ ভালোবাসাই শারদীয়া ম্যাগাজিন 'প্রতিবিম্ব' মডার্ণ ক্লাবের প্রাপ্য। অক্ষরে অক্ষরে মালা গেঁথে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া স্বপ্ন। অনায়াস লভ্য শব্দের মধ্যে শব্দ দুটি মলাটে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রচ্ছদের আকর্ষণের বদলে হয়তো স্পর্শ করে লেখক-পাঠকের অন্তর আত্মা। শত বাধা পেরিয়ে আমন্ত্রিত লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের উষ্ণ পরশ, অফুরন্ত ভালোবাসা আগামীদিনেও গুণীজনদের স্পর্শে এগিয়ে যেতে পারে আমাদের মডার্ণ ক্লাবের শারদীয়া ম্যাগাজিন 'প্রতিবিম্ব'।

সঞ্জিত নাহা (লিটন)
সম্পাদক,
মডার্ণ ক্লাব।

সম্পাদকীয়

আপনার বয়স যতই হোক, আমাদের সম্মিলিত বয়সের গড় কিন্তু খুবই কম। জানেন কতো ? মাত্র ২৯ বছর ! হ্যাঁ, আমাদের দেশের জনগণের গড় বয়স তা-ই। ভারত হলো বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দেশ। যেখানে জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের বেশি নাগরিকের বয়স ৩৫ বছরের কম। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১৪২ কোটি ৬০ লক্ষ। সম্প্রতি জনসংখ্যার দিক থেকে চিনকে ছাড়িয়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশে পরিণত হয়েছে। জনবিস্ফোরণ একটা সমস্যা হলেও আশার কথা হচ্ছে আমাদের দেশ তারুণ্যে ভরা। যুব সম্প্রদায় যে কোনো রাষ্ট্রের বড় শক্তি। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক গতিপ্রকৃতির প্রেক্ষিতে যুব সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী যখন কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় তখন সেই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে। আর এই যুব শক্তি বিপথে চালিত হলে দেশের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবে এর কিছু প্রভাব দেখাও যাচ্ছে। তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ নেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। যাদের হাতে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের মাদকের প্রতি আকর্ষণ দেশ ও জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। যে নেশা আগে বিদেশে হতো, এখন তা আমাদের হাতের কাছে চলে এসেছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে ব্রাউন সুগার, হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা, মদ। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের মতো করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। আসল কাজটা কিন্তু করতে হবে ঘর থেকেই। এর বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে ঘর, ক্লাব, পাড়া থেকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ-সবল গড়ে তোলা, তাদের সুরক্ষা দেয়ার দায়িত্ব আমার-আপনার। আসুন মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে শামিল হই। শারদ্যোৎসবের শুভ মুহূর্তে যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে দূরে রেখে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়তে অঙ্গীকার করি।

প্রতি বছর এরই পরিমণ্ডল তৈরি করতে চেষ্টা করে 'প্রতিবিম্ব'। সমাজ সচেতনতামূলক লেখালেখির পাশাপাশি এবারও 'প্রতিবিম্ব' সাহিত্যরসে ভরপুর। যা সাহিত্যপ্রেমীদের মনের খোরাক জোগাবে বলে আশা রাখি। শারদ স্মরণিকায় শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কবির কাছ থেকে কবিতা পাওয়া মডার্ণ ক্লাবের কাছে নিঃসন্দেহে একটা বিরাট প্রাপ্তি। বরেণ্য কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়সহ যে সমস্ত লেখক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞাপনদাতা 'প্রতিবিম্ব' কে সাজাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শারদ্যোৎসব প্রতিটি মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

পার্থ সারথি দেব
সম্পাদক
প্রতিবিম্ব

সুচীপত্র

পৃষ্ঠা

• **কবিতা**

এবার শ্রাবণে	শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
সে আর আমি	শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
ভাবনার ছড়া	বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী	১২
আমার চারপাশে	সুমন পাটারী	১২
লিলুয়া হাওয়া	রাতুল দেববর্মণ	১২
কাকজ্যোৎস্না	দিলীপ দাস	১২
স্বপ্নের আলোছায়া	শেখর সি দত্ত	১৯
প্রত্যাবর্তন	আকবর আহমেদ	১৯
আজকের দুর্গা	নিয়তি দাস	১৯
একতারা	বীথি চট্টোপাধ্যায়	২০
দুঃখিত	অদিতি বসুরায়	২০
শুরু থেকে শেষ	শংকর কুমার ঘোষ	২৮
বিভাজন	দীপ্তি দে	২৯
নারী দশভূজা	মনচলি চক্রবর্তী	২৯
সমর্পণ	শান্তনু রায় বর্মণ	৩০
মিশে গেছে	মৌসুমী কর	৩০
ফানুস	অসীম কর	৩০
বিশ্বকবি	ড: গোপী নন্দন দে	৩১
তিন ছড়া	ঋষভ চক্রবর্তী	৩১
পেঁজাতুলোর আকাশে	সংহিতা ভট্টাচার্য্য	৪২

• **গল্প**

চাঁদের বুড়ি	অগ্রতা দেব	১৬
দর্পচূর্ণ	পারিজাত দত্ত	৩২
আফ্‌শোস	নির্মল অধিকারী	৩৬
মরা ইঁদুর ও উদ্যোগপতি	অরুণোদয় সাহা	৪০
বৃদ্ধা যখন শিশু	পার্থ চক্রবর্তী	৪৩
খেলা ভাঙার খেলা	পূর্ণোপমা রায় বর্ধন	৬২

• **বিজ্ঞান**

চন্দ্রযান-৩ ঃ চাঁদে ভারত	অয়ন সাহা	১৩

• **প্রবন্ধ**

জাতীয় পতাকা ঃ আমাদের	পুরুষোত্তম রায় বর্মন	২১

• **চিকিৎসা**

গর্ভধারণের প্রস্তুতি বা	ডা: অপরাজিতা পাল	৫২

পৃষ্ঠা

• **আলোচনা**

তরুণ প্রজন্ম ও গ্রন্থপাঠে	দেবানন্দ ধাম	২৩
ভূমিকম্প	ড: জয়ন্ত পাল	৩৩
প্রতিবিম্বে 'প্রতিবিম্ব'	শুভঙ্কর চক্রবর্তী	৪৫
জীবনের পরশমণি	প্রণয় কুমার রায় বর্ধন	৪৯

• **ভ্রমণ**

গ্রেট মাইগ্রেশন : এক জীবন্ত বিস্ময়	-জবা চৌধুরী	২৫
বেড়াতে আসুন পড়শি দেশে	রফিকুল ইসলাম সবুজ	৫৫

• **সংস্কৃতি**

ত্রিপুরা নৃত্যকলা চর্চা	ড: পদ্মিনী চক্রবর্তী	৩৫
My .... Bharatanatyam ..	Bipasa Sen	৫৯

• **স্মৃতি কথা**

সেকাল-একাল	চন্দন কর	৩৮

• **মনিষী**

কালজয়ী শচীন দেববর্মণ	অনিন্দিতা দে	৪১
বিশ্বজনীন বিবেকানন্দ	সুব্রত সাহা	৪৬

• **জানা অজানা**

ক্রস ডোমিনেন্স	পার্বতী দাশগুপ্তা	৬০
গণপতি প্রসঙ্গে	লক্ষ্মণ দেব	৬১

• **খেলা**

স্বপ্নে ২০২৬ এশিয়ান গেমস	অলক ঘোষ	৬৩
এশিয়ান গেইমস ও ভারত	প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত	৬৪
ক্রিয়েটিভ লেন্স	বিপ্লব চন্দ	৬৪
এক যুগের প্রতীক্ষার অবসান	সরযূ চক্রবর্তী	৬৫

• **আমাদের ক্লাব**

ক্লাব ও পূজা কমিটি		৬৬

• **আঁকাবুকি**

• **ছবির পাতা**

কবিতা

সে আর আমি

শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

তার যেরকম তছনছিয়া স্বভাব
ঝড়ের পিঠে সওয়ার হয়ে আসে,
আমিও তেমন অজ পাড়াগাঁর নবাব
সন্ধ্যেবেলা মুক্তো ছড়াই ঘাসে
তার যেরকম বিরুদ্ধতার মেজাজ
হঠাৎ করে উল্টোদিকে ছোটে
আমিও তেমন আগুন জলে ভেজা
সময় বুঝে ঠোঁট বসাব ঠোঁটে
তার যেরকম উল্টোপাল্টা খুশি
হালকা রঙের বাতাসে চুল বাঁধে
আমিও তেমন সিঁদুরে মেঘ পুষি
কেমন একটা গন্ধ ছড়ায় ছাদে ..
তার যেরকম মন খারাপের বাতিক
সন্ধ্যে হলে ভাল্লাগে না কিছু,
আমিও তেমন জলের ধারে হাঁটি
বুঝতে পারি আকাশ কত নিচু
তার যেরকম জাপটে ধরে সোহাগ
আমায় ছাড়া চলে না একদিনও,
আমিও তেমন দু-চার লাইন দোহা
লেখার ওপর ছড়িয়ে থাকা তৃণ।

এবার শ্রাবণে

শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার শ্রাবণে ভাবনার অপচয়
পুরনো সন্ধ্যে ভাঙিয়ে নিয়েছি জলে
কত কারখানা এমনি বন্ধ হয়
আমার বাড়িতে সুমনের গান চলে।

আকাশ বোঝে না কত ধানে কত চাল।
তফাত জানে না বন্ধুতে বর্গিতে
বর্ষাতি রাখে শহরের হালচাল
মেঘ ঢুকে আসে ভাঙাচোরা কলোনিতে।

এবার শ্রাবণে ঘুম জমে টিপকলে
ছোট বস্তিতে বালতির পোয়াবারো
আমার বাড়িতে সুমনের গান চলে
কখনও সখনও তুমিও আসতে পারো।

দু'দিন বৃষ্টি। রিকশার ভাড়া বেশি।
অথচ বাজারে ইলিশ উঠেছে কম
ইতিহাস বলে বাতাসেরা ভিনদেশি
বুঝবে কি আর মল্লারে ঝমঝম?

খুচরোর খোঁজে দু'পকেট তোলপাড়
বেকার যুবক দাঁড়িয়েছে সং সেজে
এবার শ্রাবণে চোখকে দিয়েছি ছাড়
এই বৃষ্টিতে চশমাই শুধু ভেজে।

তবুও শহর ভিজতে পারছে কই?
মেঘ থমকেছে দূরের মফঃস্বলে
মন খারাপের চুক্তিতে হোক সই
আমার বাড়িতে সুমনের গান চলে।

কবিতা

ভাবনার ছড়া

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

এমআরপি-তে লেখা আছে এক হাজার বিশ
কেউ বেচে নয় শ'তে কেউ কেনে আটশ পঁচিশ
বাজারেতে গিয়ে কাল
হারু বলে একি হাল
এটা দেখে ওটা দেখে কিযে বলি ভাই
সঠিক মূল্য লেখা কোথাও নাই।

ম্যাক্সিমাম লেখা আছে মিনিমাম নাই
কম বেশি আমি তুমি ঠকি সব্বাই
ফিক্সড প্রাইজ হলে পরে
দরাদরি কে আর করে
ভালো না মন্দ হতো ভেবে দেখো তাই
ফিক্সড প্রাইজ হলে কারো ঠকার চান্স নাই।

লিলুয়া হাওয়া

রাতুল দেববর্মণ

কবি একাই ঝরাতে পারে
মেঘ, এই শুখা মরসুমে
গোলাপ ফোটাতে পারে
চর্যাহীন, তোমার বাগানে,
সুনসান আকাশে আউলা বাতাসে
তবু কেন অগুরু-লোবান ওড়ে
রোদ্দুরে দুপুরে!

কবি ঠিক জেনে যায়
কোথায় বারুদ গন্ধ,
উপোসি আগুনের লেলিহান
আগামী পতনের গোপন নির্যাস

পতনের আগেই ইথারের তরঙ্গ
জেগে ওঠে অবিরত কলমের ডগায়,

মেঘ ঝড়ে পড়ে লিলুয়া হাওয়ায়।

আমার চারপাশ

সুমন পাটারী

আমার সমুদ্রের নাম রাজনৈতিক অন্ধকার
আমার নদীর নাম বেকারের মিছিল
আমার ঢেউয়ের নাম হাসপাতালের ভিড়
আমার পাহাড়ের নাম হিংসা
আমার ফুলের নাম ক্ষমতার অপব্যবহার
আমার মন্দিরের নাম বিধর্মীদের প্রতি ছড়ানো ঘৃণা
আমার শিক্ষার নাম গান্ধীজির তিন বাঁদরের চেয়ার
আমার লক্ষ্য জুতা হয়ে উঠা
ক্ষমতার পায়ের, পিঁপড়া দমনের
আমার বিচারের নাম অন্ধপুতুল
আমার সংস্কৃতি ধর্ষণ

আমি এসবের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছি
লিখছি, যা লেখার কোনো অর্থ নেই

কাকজ্যোৎস্না

দিলীপ দাস

এই কাকজ্যোৎস্নায় সবাই গেছে নির্জনতার বনে
ছেলেকে দিয়েছি দশ হাজারী বাইকের সওয়ারি
মদ-গাঁজা-মাংস ফ্রি
আগুনে হিংসেতেই তার আনন্দের ভেরী
দ্বিগুণ বেজে ওঠে
আমিও তার ভাগ পাই
আমার খোয়ারি
সারাদিনই আমাকে রাঙায় ——
সদানন্দ —— সদানন্দ —— রামানন্দ হে ——

বি
জ্ঞা
ন

চন্দ্রযান-৩
চাঁদে ভারত

অয়ন সাহা

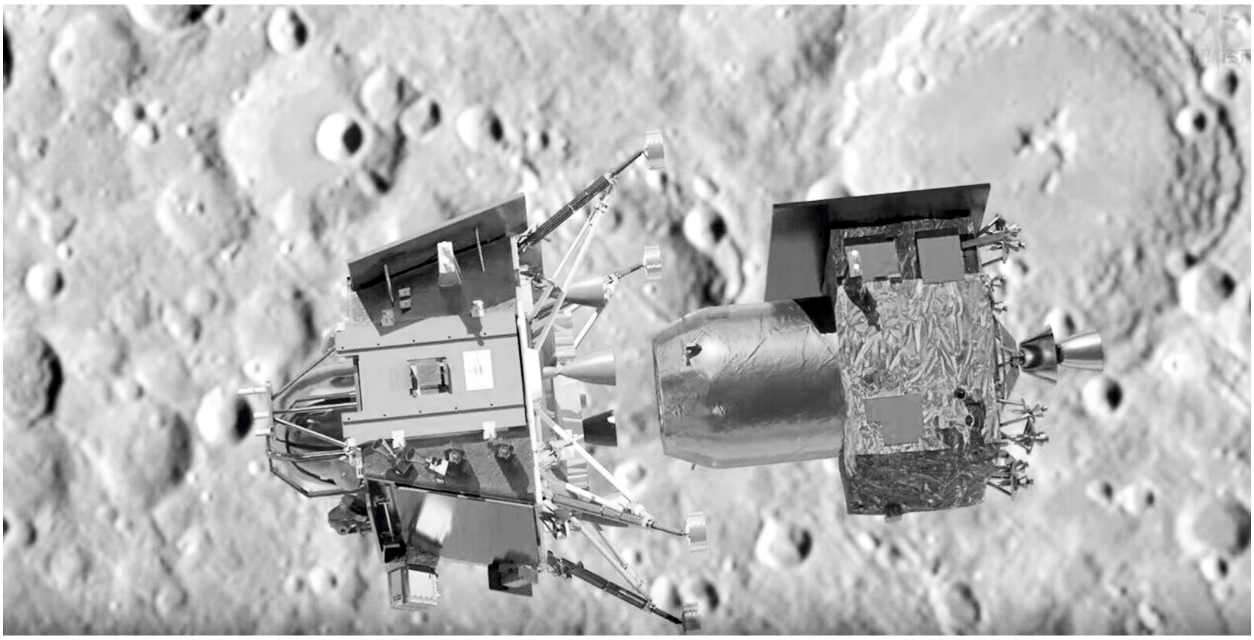

চাঁদ জয়ের ইতিহাস

৪ অক্টোবর ১৯৫৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাত্র বারো বছর আগের স্মৃতি। যুদ্ধ শেষে পৃথিবীতে শক্তির দুটি অক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা। মহাকাশে স্পুটনিক-১ পাঠালো সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। মাত্র ৫৮ সেন্টিমিটারের একটি গোলক। পৃথিবীর সাথে সফলভাবে যোগাযোগ করল যন্ত্রটি। শুরু হলো মহাকাশ যুগ। এক মাসের কম সময়ে, নভেম্বরের ৩ তারিখ মহাকাশে পাড়ি দিল পৃথিবীর প্রথম প্রাণী, মস্কোর পথপুকুর 'লাইকা'। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল মহাকাশে প্রথম মানুষ ইউরি গ্যাগারিন। একের পর এক সোভিয়েত সাফল্য! আমেরিকার উপর চাপ বাড়লো। ১৯৬১ সালের ২৫শে মে রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি ঘোষণা করলেন এই দশকের মধ্যেই একজন আমেরিকানকে চাঁদে পাঠিয়ে অক্ষত অবস্থায় পৃথিবীতে ফেরত আনা হবে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের পর, সাফল্য এলো ১৯৬৯ সালের ২০ আগস্ট। চাঁদে পা ফেললেন নীল আর্মস্ট্রং। চাঁদের বুকে রাখা ফলকে লেখা রইল- 'We came in peace for all mankind'।

ভারতের যাত্রা শুরু

১৯৬৯ সালের ১৫ আগস্ট যাত্রা শুরু করলো ইসরো; ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন। একটি উন্নতিশীল দেশের বিকাশে মহাকাশ প্রযুক্তির গুরুত্ব প্রথম বুঝতে পারেন ডক্টর বিক্রম সারাভাই। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে পরমাণু শক্তি দপ্তরের অধীনে তৈরি হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ বা INCOSPAR। তিরুবনন্তপুরমের মৎস্যজীবীদের গ্রাম থুম্বায় সেন্ট মেরি ম্যাগডিলিন চার্চে বিজ্ঞানীদের অফিস তৈরি হয়। ইন্টারনেট ঘাঁটলে এখনো ভেসে উঠে সাইকেলে, গরুর গাড়িতে চাপিয়ে রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বহনের ছবি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের প্রবল অধ্যাবসায় ও ইচ্ছা শক্তির কাছে হেরে যায় সব বাধা। তাই চন্দ্রযান তিনের সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরো লিখলো, ভারত পৌঁছে গেছে 'সাইকেল সে চাঁন্দ তক।

চাঁদের পথে চন্দ্রযান

১৪ জুলাই ২০২৩, শুক্রবার, সময় দুপুর ২ টা বেজে ৩৫ মিনিট। চাঁদের উদ্দেশে রওয়ানা হল চন্দ্রযান-৩। প্রবল গর্জনে সাড়ে ৪৩ মিটার লম্বা, ৬ লক্ষ ৪২ হাজার কেজি ওজনের এল.ভি.এম থ্রি এম-ফোর রকেট যাত্রা শুরু করল অন্ধপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে। এবারের চন্দ্র অভিযানের মূলে রয়েছে এই এলভিএম থ্রি। ভারতের বাহুবলি রকেট। এর মধ্যে দুটি স্তরে কঠিন এবং একটি স্তরে তরল জ্বালানি রয়েছে। কঠিন জ্বালানি চলেছে ১২৭ সেকেন্ড, তরল ২০৩ সেকেন্ড। এভাবেই চন্দ্রযান পৌঁছে যায় নির্ধারিত পৃথিবীর কক্ষপথে। বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে এই কক্ষপথ পরিবর্তন করতে থাকেন।

৫ আগস্ট, পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে

পড়ে চন্দ্রযান। এরপর চাঁদের আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে তার চারপাশে পাক খেতে খেতে ক্রমশ গতি কমিয়ে চন্দ্রযান-৩ চলে আসে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে। এরপরই শুরু হয় অভিযানের সবচেয়ে কঠিন পর্ব। ২৩ আগস্ট সন্ধ্যায় চাঁদের মাটিতে অবতরণ।

ব্যর্থতা থেকে উত্তরণের শপথ

চার বছর আগে ঠিক এই পর্যায়ে এসেই ব্যর্থ হয়েছিল চন্দ্রযান-২। ২০১৯ সালের ৭ জুলাই চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে 'সিমপেলিয়াস-এন' এবং "ম্যানজিনাস-সি" নামে দুটি গহ্বরের মাঝখানে নামার চেষ্টা করেছিল চন্দ্রযান-২ এর অবতরণ যান 'বিক্রম'। বিক্রমের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছোট্ট একটি গাড়ি বা রোভারের চাঁদের মাটিতে চলাফেরা করার কথা ছিল। কিন্তু চাঁদের মাটি ছোঁয়ার মাত্র তিন মিনিট আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল বিক্রম। মাস তিনেক ধরে বিক্রমের ধ্বংসাবশেষের অনবরত খোঁজ চালিয়েছিল আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা; কিন্তু কোনভাবেই তা চিহ্নিত করতে পারেনি তারা। শেষমেষ লুনার রি-কনেইস্যান্স অরবিটারের তোলা কয়েকটি ছবি শেয়ার করে বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্য চায় নাসা। সেই ছবি বিশ্লেষণ করে চেন্নাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার সম্মুগ সুব্রামনিয়ান বিক্রমের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করেন। সেদিন আশা ভঙ্গের কালো রাত দেখেছিল ভারত। বিদেশি শত্রুরা ঠাট্টা-তামাশা করেছিল আমাদের মহাকাশ গবেষণা নিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা থেমে থাকেননি। ৪টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন আবারো চাঁদে অভিযানের জন্য। তারই ফসল চন্দ্রযান-৩। এবারে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সাথে হাত মিলিয়েছে আরো কয়েকটি বাণিজ্যিক সংস্থা। চন্দ্রযান-২ এবং ৩ এর মূল পার্থক্য হল চন্দ্রযান-২ তে ছিল একটি অরবিটার বা চাঁদকে প্রদক্ষিণকারী যন্ত্র। সে কিন্তু এখনো সফলভাবে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। চন্দ্রযান-৩ এ চাঁদকে প্রদক্ষিণকারী কোন আলাদা যন্ত্র থাকছে না। একটি রকেট সদৃশ যন্ত্র বা প্রপালশান মডিউলের মাধ্যমে চাঁদের কাছে পৌঁছে তার থেকে অবতরণকারী যান বা ল্যান্ডার বিক্রমকে চন্দ্রপৃষ্ঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সফলভাবে অবতরণ করে বিক্রমের ভেতর থেকে ছোট ২৬ কেজি ওজনের ৬ চাকার গাড়ি বা রোভার প্রজ্ঞান চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের পাঁচটি যন্ত্র চাঁদের মাটিতে চালিয়েছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

> "মঙ্গলে গ্রহে যাওয়ার আগে চাঁদ হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপের মতো। আর মহাকাশের গভীরে ব্যবহার করার মতো প্রযুক্তির পরীক্ষা চালানোর জন্য চাঁদ সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ থেকে কোন মহাকাশযান পাঠাতে কম জ্বালানির দরকার হয়। চন্দ্রযান-এক চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে জলের সন্ধান দিয়েছে। একে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙে ফেলা যায়। যাকে মঙ্গল বা মহাকাশের অন্য কোন স্থানে যাওয়ার জন্য মহাকাশযানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

২৩ আগস্ট চন্দ্রযান-৩ এর অবতরণের পর্যায়টি টিভি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রচার করেছিল ইসরো। রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এই সরাসরি সম্প্রচার দেখেছে। উচ্ছ্বাসে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছে গোটা দেশ। সেদিন দেশের বাইরে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছাব্বিশ আগস্ট দেশে ফিরেই সকাল সকাল চলে যান ইসরোর সদর দপ্তরে। বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি একাধিক ঘোষণা করেন তিনি। চাঁদের মাটিতে যে জায়গায় ভারতের তৃতীয় চন্দ্রযানটি অবতরণ করেছে, তার নাম এখন থেকে 'শিবশক্তি'। তিনি বলেন, "যেখানে চার বছর আগে চন্দ্রযান-২ ভেঙে পড়েছিল, তার নাম হবে 'তেরঙা'। এই স্থানটি মনে করাবে, ব্যর্থতাই শেষ নয়। তার পরেও সাফল্যের পথ খোলা থাকে।" ২৩ অগস্ট চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণের দিনটি এখন থেকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসাবে পালন করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কী আবিষ্কার করল চন্দ্রযান?

চন্দ্রযান-৩ ইতোমধ্যেই নতুন নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞান যেভাবে গবেষণা চালিয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়।

বিক্রমের ChaSTE চাঁদের তাপমাত্রা এবং আয়োনোস্ফিয়ারের ঘনত্ব পরিমাপ করেছে। এরই মধ্যে একটি বিরল তথ্য উঠে এসেছে আর তা হল চন্দ্রপৃষ্ঠকে ঘিরে থাকা বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত প্লাজমার ১০০ কিলোমিটার পুরু স্তরে আয়ন ও ইলেকট্রনের মিশ্রণ। এটি তুলনামূলকভাবে বিরল। প্লাজমার প্রাথমিক পরিমাপ প্রতি ঘন মিটারে প্রায় ৫ মিলিয়ন থেকে ৩০ মিলিয়ন ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে চাঁদে দিনের সময় এই ঘনত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই ঘনত্ব প্রতি ঘন মিটারে এক মিলিয়ন। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যদি চাঁদে মানুষ বসবাস করে তাহলে এই আয়োনোস্ফিয়ারের ঘনত্ব কাজে লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। আয়োনোস্ফিয়ারে ইলেকট্রনের ঘনত্ব যত বেশি হবে তত রেডিও সংকেত যেতে বাধা পায়। ঘনত্ব কম হলে রেডিও সংকেত অনেক বেশি সুবিধাজনক হয়ে থাকে। চাঁদের তাপমাত্রা নিয়েও নতুন তথ্য দিয়েছে এই যন্ত্রটি। চাঁদের পৃষ্ঠে তাপমাত্রা যখন

৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন মাটির আট মিলিমিটার গভীরে তাপমাত্রা কমে হয়েছে -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতে প্রমাণিত হয় যে চাঁদের মাটি তাপের কুপরিবাহী। চন্দ্র কম্পন অর্থাৎ চাঁদে ভূমিকম্পের খবর দিয়েছে বিক্রমের ILSA।

রোভার প্রজ্ঞানের LIBS যন্ত্রটি চাঁদের মাটিতে সালফারের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ক্যালসিয়াম এবং লোহা মিলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, চাঁদের মাটিতে সন্ধান পাওয়া গেছে অক্সিজেনের।

ভবিষ্যতে চাঁদ নিয়ে পরিকল্পনা

মহাকাশ গবেষণায় অগ্রণী বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে হঠাৎ করেই চাঁদ নিয়ে একটা শোরগোল শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার আর্টেমিস ওয়ান মিশন চাঁদের কক্ষপথ ঘুরে এসেছে। এতে এমন একটি মহাকাশ যান ব্যবহার করা হয়েছে যেটি মানুষকে চন্দ্রপৃষ্ঠে নিয়ে যেতে সক্ষম। স্পেসএক্স জাপানিজ বিলিয়নিয়ার ইউসাকু মায়জাওয়া এবং আরো আট যাত্রীকে নিয়ে চলতি বছরের শেষের দিকে 'ডিয়ারমুন ভয়েজে' কর্মসূচির অংশ হিসেবে চাঁদের চারপাশে ঘুরিয়ে আনবে। এটা হবে প্রতিষ্ঠানটির অন্তত ১০০ জন মানুষকে বহন করতে সক্ষম স্টারশিপ যানের প্রথম মিশন। নাসা ২০২৪ সালে তাদের পরবর্তী চন্দ্র অভিযান শুরু করবে বলে জানিয়েছে। এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছে আর্টেমিস টু। সংস্থাটি চাঁদে পাঠানোর জন্য চার জনের এক দল ঘোষণা করেছে। নাসা তাদের আর্টেমিস থ্রি মিশনটি পাঠাবে ২০২৫ বা ২০২৬ সালে। এছাড়া চীন রাশিয়ার সাথে মিলে ২০৩৫ সালের মধ্যে চাঁদে একটি যৌথ ঘাঁটি স্থাপন করবে বলে জানিয়েছে।

মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার আগে চাঁদ হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপের মতো। আর মহাকাশের গভীরে ব্যবহার করার মতো প্রযুক্তির পরীক্ষা চালানোর জন্য চাঁদ সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ থেকে কোন মহাকাশযান পাঠাতে কম জ্বালানির দরকার হয়। চন্দ্রযান-এক চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে জলের সন্ধান দিয়েছে। একে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙে ফেলা যায়। যাকে মঙ্গল বা মহাকাশের অন্য কোন স্থানে যাওয়ার জন্য মহাকাশযানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া, চাঁদে যাত্রা নিয়ে এ পর্যন্ত যে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে তা অর্থনীতির এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

চিরঘুমের দেশে চন্দ্রযান-৩

চন্দ্রযান মিশনের আয়ু ছিল ১৪। কারণ চাঁদের একদিন পৃথিবীর প্রায় ১৪ দিনের সমান। ওইটুকু সময়ই বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের উপর সূর্যের আলো পড়বে। ওরা শক্তি পাবে। শিবশক্তি পয়েন্টে ১৪ দিন বাদে রাত নেমেছে। চিরঘুমে ডুবেছে চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞান। আর তাদের জাগানো যাবে না।

Restaurant

Indrani

Prop. Ratan Deb

9436121216/ 9774774246

Battala, Agartala, Tripura (W)

গল্প

চাঁদের বুড়ি

অগ্রতা দেব (অষ্টম শ্রেণি)

শব্দটা ভারী চমৎকার। মার হাতের চুড়ি ঝনঝন করার মতো। শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নায় ভরে গেলো ঘরটাও। রাতের খাবার খেয়ে সবেমাত্র বিছানায় গেছি। চোখ একটু লাগতেই বিকট অথচ খুব মিষ্টি শব্দটা কানে এলো। হুড়মুড় করে উঠে পড়ি। উঠোনেই কিছু একটা হয়েছে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। পুরো উঠোনটা ভরে রয়েছে আলোয় আলোয়। জ্যোৎস্নায় স্নান করে আছে বড় আম গাছটা। ফুলের টবগুলো থেকেও আলোকরশ্মি ঠিকরে বেরুচ্ছে। উঠোনের এক কোণে ঠাকুরঘরের বারান্দায় খেলা করছে মায়াবী আলো। আলোর বন্যায় যেন স্বপ্নপুরি হয়ে আছে গোটা বাড়িটা। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হলো একসাথে হাজারটা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ছেয়ে আছে চারদিক।

আমাদের উঠোনটাও বেশ বড়। উঠোনের চারপাশে কাকা, জ্যাঠাদের ঘর। নানারকম গাছগাছালিতে ভরা বাড়ি। রাতে হঠাৎ শব্দের সাথে আলোর বিস্ফোরণে কিচিরমিচির করে জেগে উঠেছে পাখিগুলোও। একটু একটু করে উঠোনের দিকে পা বাড়াই।

ভীষণ আলোকোজ্জ্বল একটা বড়ো গোলাকার বস্তু পড়ে রয়েছে মাঝ উঠোনে। এর দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম। জন্মদিনের গোল বেলুনের ভেতর হাজারটা টিউব লাইট জ্বলে উঠলে দেখতে যেমন হবে ঠিক তেমনই। শুধু আকারে অনেকটা বড়। আমাদের খড়ের গাঁদার মতো। এর দীপ্ত আলো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। খুব সাবধানে একটু একটু এগোই। মায়াবী ঐ আলোর ভেতর থেকে কিসের যেন ঠকঠক শব্দ আসছে।

ভেতরে দেখি এক বুড়ি বসে আছেন। দেখতে ঠিক আমার ঠাকুরমার মতো। সাদা চুল। পরনেও সাদা কাপড়। গোঁজা হয়ে বসে একমনে চরকায় সুতা কাটছেন। ধোঁয়াশাচ্ছন্ন আলো কেটে আমি ভেতরে প্রবেশ করতেই বুড়ি চিৎকার করে উঠে- "কে.. রে? কে- তুই?"

আমি হতচকিত হয়ে পড়ি। বললাম— "আমার নাম তাথৈ।" বিস্ময়ের সাথে আমিও জিজ্ঞেস করি—"তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? এতো আলো কেন?"

বুড়ি সোজা উত্তর না দিয়ে বলে— "তুই মানুষ?" বললাম— "হ্যাঁ।" আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখলো বুড়ি।

তারপর বললো— "আমার প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর বয়সে এখন পর্যন্ত আমি নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিনসহ মাত্র ১২ জন মানুষকে দেখলাম। তারা তো তোর মতো ছিলো না। পরনে ছিলো ভারী ভারী সাদা রঙের পোশাক। ছিল বিদঘুটে চশমা। পিঠে ভারী যন্ত্রপাতি। তারা রকেটে করে এসেছিলো। তুই কী করে এলি?"

এই অল্প সময়েই বুড়িকে খুব ভালো লেগে গেছে। বললাম— "আমি কোথাও যাইনি। তুমি এসেছো আমার বাড়ির উঠানে।"

বুড়ি খুব অবাক হলো। বললো—"তাই নাকি!"

ভালো করে চারিদিক দেখে নিয়ে জানতে চাইলো— "এটা পৃথিবী?"

আমি ঘাড় নাড়তেই হাসলো বুড়ি। নিজের পরিচয় দিয়ে বললো— "আমি চাঁদের বুড়ি। সারাক্ষণ চরকা কাটি। আজ পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চাঁদ যাচ্ছিলো তো, মনে হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে চাঁদ নিচে পড়ে গেছে। আর পড়লো তো পড়লো, ঠিক তোর বাড়ির উঠোনে।"

বুড়ির পরিচয় পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। লাফ তো দিলাম। কিন্তু পা দুটি আর নিচে পড়ছে না। কখনও নিচে লাগছে, তো আবার গুত্তা খেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছি। আমার অবস্থা দেখে বুড়ির কি মজা!

বললাম— "আমি এতো লাফাচ্ছি কেন? বুড়ি হেসে বললো— "আরে বোকা, এটা চাঁদ। এখানে ওজন কমে যায়। পৃথিবীতে তোর ওজন ষাট কেজি হলে, চাঁদে হবে দশ কেজি।

চাঁদে ঢুকে তুই অনেক হালকা হয়ে গেছিস। পৃথিবী থেকে চাঁদের ভর কম হওয়ায় এমনটা হয়। তাই হাঁটতে গিয়েও লাফাচ্ছিস তুই।"

কোনো পরিশ্রম ছাড়া লাফাতে বেশ ভালোই লাগছে। লাফাতে লাফাতেই প্রশ্ন করি— "আজ পৃথিবীর এতো কাছ দিয়ে কেন যাচ্ছিলে?"

গালের চামড়া একেবারে কুঁচকে গেছে বুড়ির। কিন্তু হাসিটা খুব সুন্দর। সেই হাসিমাখা মুখে বললো— "এমনিতে পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশ কিলোমিটার। কিন্তু পৃথিবীর চারিদিকে নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ কখনও কখনও কাছে চলে আসে। আবার কখনও দূরে চলে যায়। আজ পৃথিবীর কাছ দিয়ে যাবার সময়ই তো ধপাস করে তোদের উঠোনে পড়ে গেলো চাঁদ।"

বললাম— "ভালোই হলো। তোমার সাথে দেখা হয়ে গেলো।" বুড়ি বললো— "এখন পর্যন্ত মাত্র ১২ জন পৃথিবীবাসী চাঁদে গেছেন। এদের একজনের সাথেও কথা হয়নি। প্রথমবার ১৯৬৯ সালে আমেরিকার নিল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন। এরপর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছয়বার মানুষ চাঁদে নামেন। এতোগুলো বছর পেরিয়ে গেলো। আর কেউ চাঁদে পা রাখলো না।"

> "আমি ঘাড় নাড়তেই হাসলো বুড়ি। নিজের পরিচয় দিয়ে বললো— "আমি চাঁদের বুড়ি। সারাক্ষণ চরকা কাটি। আজ পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চাঁদ যাচ্ছিলো তো। মনে হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে চাঁদ নিচে পড়ে গেছে। আর পড়লো তো পড়লো, ঠিক তোর বাড়ির উঠোনে।"

চাঁদে আরও বেশি বেশি মানুষ না যাওয়ায় বুড়ি দুঃখ করে বলছিলো — "পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। সুখে, দুঃখে সবসময় পৃথিবীর সাথে সাথেই চাঁদ ঘুরছে। চাঁদ না থাকলে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাঁটা হবে না। পৃথিবীর গতি বেড়ে গিয়ে দিনের সময় অনেকটা কমে যাবে। জ্যোৎস্নাভরা রাত পাবে না পৃথিবীর মানুষ। চাঁদ ছাড়া পৃথিবী সুন্দর থাকবে না। চাঁদ মামার টুকুন পাবে না শিশুরা। চাঁদের রূপ নিয়ে গান, কবিতা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। চাঁদ না থাকলে রাত আরও নিকষ কালো হয়ে উঠবে। মানুষের উচিত আরও গবেষণার মধ্য দিয়ে চাঁদকে আপন করে নেয়া।"

বললাম— "একদম ঠিক। কিছুদিন আগে আমাদের দেশ এজন্যই তো চাঁদে রবোট পাঠালো। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে তো আর কোনো দেশ এর আগে নামতে পারেনি। চাঁদ নিয়ে আরও গবেষণা করতেই তো চন্দ্রযান পাঠিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা — ইসরো।"

বুড়ি ঘাড় নাড়ে। এরমাঝেই প্রশ্ন করি—"আমাদের ছোট্ট প্রজ্ঞানকে দেখেছো?"

বুড়ির মুখে হাসি। বলে— "আর বলিস না! তোদের মামার কি যে কাতুকুতু! চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামলো। এরপর বিক্রমের পেট থেকে বেরিয়ে এলো ছোট্ট প্রজ্ঞান রোভার। এটি তার ছয় চাকা নিয়ে একটু একটু করে হাঁটছে, আর কাতুকুতু লাগছে চাঁদ মামার।"

বুড়ি বলে চলে— "তোদের পৃথিবীতে তো চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন। আর চাঁদের একদিন হয় পৃথীবির চৌদ্দ দিনের সমান। এই চৌদ্দ দিন চাঁদের বুকে টানা সূর্য হাসে। সূর্যের আলো খেয়ে খেয়েই তো এ ক'টা দিন চাঁদে কাটালো ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান।" চাঁদে যে টানা চৌদ্দ দিন রাতও থাকে সে কথাও জানালো বুড়ি।

মনযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম। বললাম— "একটা প্রশ্ন করি?" বুড়ি বললো— "কর।"

"প্রথমবার চাঁদের মাটিতে পা রাখা নিল আর্মস্ট্রং ও শেষবার পা রাখা হ্যারিসন শ্মিটদের মধ্যে কারো সাথে তোমার কথা হয়নি কেন?"

বুড়ি মুচকি হেসে বললো— "কী করে কথা হবে? আমি সত্যি সত্যি আছি নাকি?"

"ওমা! এ কেমন কথা! তুমি নেই মানে?" ---বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

বুড়ি বললো— "না, আমি নেই। এটা পৃথিবীবাসীর কল্পনা। চরকাও নেই, চরকা কাটা বুড়িও নেই।"

"দাদু, ঠাকুরমাদের কাছে তো তোমার কতো গল্প শুনেছি। তুমি চাঁদে বসে চরকায় সুতা কাটো। তোমাকে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়। চাঁদের গায়ে ছোপ ছোপ কালো দাগ দেখিয়ে বলা হয় চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।" —একনাগাড়ে বলে গেলাম।

বুড়ি বললো— "এসব শোনা কথা। চাঁদে বুড়ির অস্তিত্ব তো দূরের কথা, একটা কীট-পতঙ্গও নেই। শুধু খানাখন্দে ভরা চাঁদ। বহু কোটি বছর আগে সৌর জগতের গ্রহ, উপগ্রহের উপর ছোট-বড় অসংখ্য উল্কাপিণ্ড ও পাথর আছড়ে পড়েছিলো। চাঁদও

ওই ভারী ভারী গোলার আঘাত থেকে রেহাই পায়নি। এরফলে চাঁদে বিশাল বিশাল গভীর গর্ত তৈরি হয়। এসব গর্ত পরে লাভায় ভরে যায়। বছর বছর পরে লাভাও ঠান্ডা হয়ে আসে। ঠান্ডা লাভায় অনেক বেশি মাত্রায় আয়রন আছে। আয়রনের মাত্রা বেশি থাকায় ঐ জায়গাগুলো কম পরিমাণ সূর্যালোক প্রতিফলিত করতে পারে। ফলে পৃথিবী থেকে কালো কালো ছোপ দেখা যায়। যাকে মানুষ চাঁদের কলঙ্ক বলে থাকেন। আর মানুষ তার কল্পনায় আমাকে বুড়ি বানিয়ে এরমাঝেই বসিয়ে দিয়েছে। আর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সুতা কাটার চরকা।”- বলেই বুড়ির কি হাসি। শুনে আমিও হাসছি বুড়ির সাথে।

হাসতে হাসতে বিছানা থেকে পড়ে যাবার জোগাড়। ভাগ্যিস আমার পাশে মা শুয়েছিলেন। ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে মা বললেন— “কী স্বপ্ন দেখলি?” আমি লাজুক হাসিতে বললাম— “চাঁদের বুড়ি।”

[গল্পটি ছন্দনীড়ের ছোটো গল্প প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ গল্পের পুরস্কার পেয়েছে। সামান্য সংযোজন করে গল্পটি এখানে প্রকাশ করা হল]

Unique
Makeover & Spa

- Threading
- Manicure
- Pedicure
- Bridal Makeup
- Facial
- Spa
- Massage
- Smoothening
- Hena
- Hair Cur
- Straightening
- Party Makeup

Bhattapukur, Sardarpukurpar
Agartala, Tripura (W)

কবিতা

স্বপ্নের আলোছায়া

শেখর সি দত্ত

দীর্ঘ নিঃশ্বাস রাত
মনের ভিতর নির্বাক প্রেম
আলসেমুড়ি ভেঙ্গে
এক দেহে লীন
রাসভারি বিরহকালের লুটোপুটি
ভালবাসার মসৃণ রঙিন শয্যায়।
স্বপ্নের মেয়াদ শেষের আগে
সকাল রবি দহন ছড়াবার আগে
কাজের মাসি ঘন্টি বাজাবার
একটু আগে—
স্নানান্তে এসে জাগালে,
দেখি তোমাতে মোনালিসা জেগে,
সেদিন অফিস যাইনি
সারাদিন কাটে স্বপ্নীল সোহাগে।
স্বপ্নের মেয়াদ শেষে
ঘরময় আমার দীর্ঘশ্বাসে,
হাসি কান্নার তীব্র দহন
হৃদয় যন্ত্রণার অদ্ভুত যাপন।
স্বপ্নীল দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া
এক অপঠিত উপন্যাস।।

প্রত্যাবর্তন

আকবর আহমেদ

মাঝে মাঝে ঠিকানা বদল হয়
যত বেশি কথা, তার চেয়ে বেশি নির্জনতা
জন্মে পাওয়া গ্রামের ছবি, শহর ও স্বদেশ
অনুভবের সাথে বিদ্রুপ করে।

স্মৃতির তলপেটে ব্যথার প্রখরতা
মিশে যায়, বন্যার ঘোলা জলে।

যে কবিতা ফুঁসে উঠেছিল ভাষাহীন বিকেলে
সব বিসর্জন দিয়েছি বিগত শারদ মরশুমে
ক্ষতবিক্ষত দেহাংশ শুধু পূর্ণতা বোঝে
হৃদয়কমলে প্রবেশের পথ খুঁজে।

প্রতিটি বিশ্বাসের ঝিলমিল আভা
ধ্বংসের চেয়েও বড় হয়ে, ইঙ্গিতে ও ইশারায়
পদক্ষেপকে মার্চপাস্টের সাথে মেলায়।

আজকের দুর্গা

নিয়তি দাস

আমাদের সুকন্যা ছুটে যায় প্যান্ডেলে,
বলছে সবাই কে ডেকে --
আশ্বিনের বাতাস চলে যাচ্ছে--
মা কেন আজও আড়ালে।
শিউলিরা চেয়ে আছে মুখ তোলেসিংহ বাহনে আসবেন না,
মা সিংহীবাহনে আসবেন --নারী জাতী বলে।
আজকের দুর্গা আগে --কোন প্যান্ডেলে দিবেন সাড়া,
কেউ না জানুক আমি জানি একটা প্যান্ডেল আমার পাড়া।
নানা জাতের গাছেরা শুনতে পাবে ঘোড়ার খুরের ধ্বনি
সুকন্যা বলছে এবার তাকিয়ে থাকলে সবাই দেখতে পাবি।
আজকের দুর্গা আসবেন নাকি বারো হাত নিয়ে,
একথা বলছে আমায় সুদাম কাকার মেয়ে।
আরও বলছে---এবার আজকের দুর্গার হজার হাজার কাজ,
চাঁদে যাও সূর্যে যাও--পৃথিবীর তো দায় নেই, যেন আস্ত
মহারাজ। বলছে আরও নীল গগনের শশীকার্তিকে
আসবেনই মা
এসেই ল্যাপটপ খুলে নিবেন
দেশের খবর মনটা আমার ভরে উঠলো--
এই খবরটা শুনার পর ।

কবিতা

একতারা

বীথি চট্টোপাধ্যায়

একটি নৌকা কুয়াশার বুক চিরে
ছোট ছোট গ্রাম পদ্মার দুই তীরে।

কোনও গ্রাম শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে
কোনও গ্রাম ছেয়ে আল্লা হো আকবরে।

পদ্মার জল একটি নৌকা তাতে
লালন ফকির একতারা ধরে হাতে

সেই একতারা সুর হয়ে ওঠে ভেসে
মক্কা মদিনা বারাণসী হৃষীকেশে

মক্কা মদিনা সব এই দেহ মনে
যে আছে কাবায় সেইতো বৃন্দাবনে

সে আছে নদীতে নদী তীর জুড়ে আছে
লালনমাজার কালীগঙ্গার কাছে

লালনের বাড়ি শিলাইদহর পাশে
ঝিনাইদহতে এখনও নাকি সে আসে।

এখনও নাকি সে গঙ্গায় পদ্মায়
একতারা নিয়ে নদীজলে বয়ে যায়

একতারা নিয়ে পানির ওপর জলে
জলের ওপর পানিতেও ভেসে চলে

ঠাকুরবাড়ির জমিদারি জলপানি
জ্যোতিদাদা তাঁর ছবি আঁকে একখানি।

যার ছবি আঁকা নদী আর নদীচরে
সুর মিলে যায় আল্লা ও ঈশ্বরে।

সুর মিলে যায় মাটি আর নদীজলে
একটি নৌকা পদ্মার বুকে চলে।

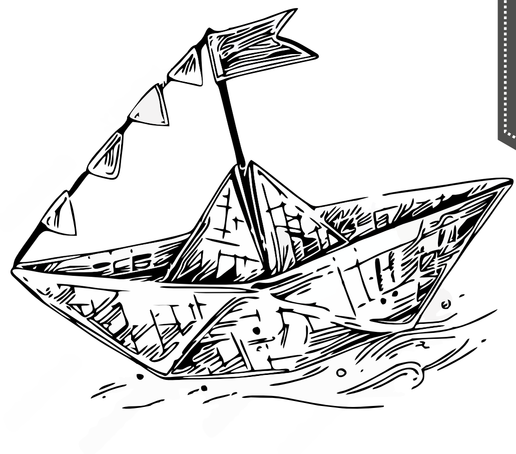

দুঃখিত

অদিতি বসুরায়

জন্মের আগে থেকেই অপরাধী হয়ে আছি বলে
ভাতের থালার ছাঁই, আমার চোখে পড়ে না।
চোখে পড়ে না, কালো দেওয়ালে বসে থাকা সবুজ ঘাসফড়িং
—আমাকে দায়ী করে, তোমার ঘর, এলোমেলো হয়ে থাকে
—তুলসীগাছ শুকিয়ে যায় — কাঁচ ভাঙে — ঘড়ি নিয়মিত পিছিয়ে পড়তে থাকে।
প্রতিদিন আমি অন্তত ছাব্বিশবার 'দুঃখিত' বলি
তিনবার চোখ মুছি। গোপনে ভেজা রুমাল সব ফেলে আসি
চোরাগলিতে।
আমার তো অহংকার অনিঃশেষ।
আমার আকাশমুখো গ্রীবা —
আমার ছোটার মতো হাঁটা
তাই চশমার ওপারের কালশিটে কেউ দেখেনি
কেউ জানতেও পারেনি, সেই কবেই আমি অন্তরা ধরে বসে আছি
তুমি সুর কাটলে, বিরক্তি জানিয়েছো
আমি মাথা নিচু শিখে নিয়েছি
এখন প্রতিদিন আমি অন্তত ছাব্বিশবার 'দুঃখিত' বলি
তিনবার চোখ মুছি। গোপনে ভেজা রুমাল সব ফেলে আসি
জাহাজঘাটায়।

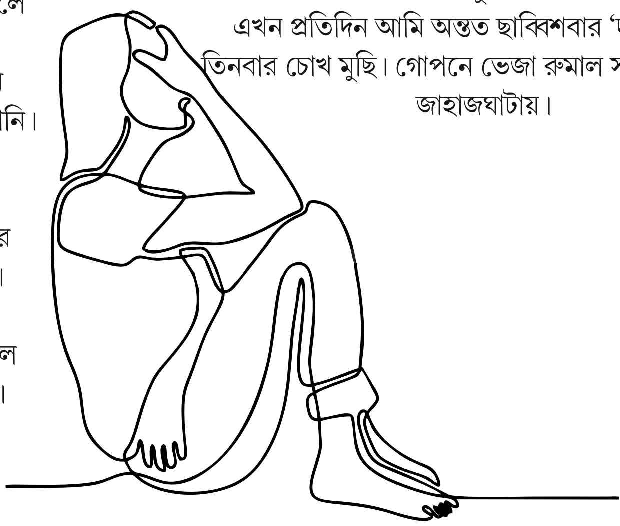

প্রবন্ধ

জাতীয় পতাকা
আমাদের ভালোবাসা, শপথ ও স্বপ্ন

পুরুষোত্তম রায় বর্মন

১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। সারা পৃথিবী যখন ঘুমিয়েছিল তখন ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর মধ্যরাত্রিতে, ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত জেগে উঠেছিল, গভীর নিদ্রা থেকে। নিয়তির সাথে আমাদের অভিসার শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, লালকেল্লায় উত্তোলন করেছিলেন জাতীয় পতাকা, তেরঙ্গা ঝান্ডা। এই উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল আমাদের অভিযাত্রা, স্বাধীন দেশ হিসেবে।

শতাব্দীর পর শতাব্দীর নিদ্রা থেকে ভারতের জাগরণ। সারা দেশে আসমুদ্র হিমাচলে ঘরে ঘরে তিরঙ্গা ঝান্ডা। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা ভুলে, দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার ব্যথা বুকে নিয়েও দেশবাসী জাতীয় পতাকা তুলছে ঘরে ঘরে। স্মরণ করছে লক্ষ শহিদের রক্ত স্রোতকে। অভিনন্দন জানাচ্ছে মহান দেশপ্রেমিক বীরদের যাদের আত্মত্যাগের উপর দাঁড়িয়ে আকাশে মাথা তুলেছে জাতীয় পতাকা। ঘোষণা দিয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশের।

স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলোতে জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে হাজার হাজার দেশবাসী অসীম সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে, বুকের রক্তে রাজপথ ভিজিয়ে, ফাঁসির দড়ির গলায় চুমু দিয়ে, পিঠে চাবুকের দগদগে ক্ষত নিয়ে, কালাপানি পেরিয়ে সেলুলার জেলে ঘানি টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন জাতীয় পতাকার গৌরব ও মহিমাকে।

১৯১১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজি প্রথমবারের মতো স্বরাজ পতাকা উত্তোলন করেন। এই স্বরাজ পতাকাই পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান তিরঙ্গা ঝান্ডা বা জাতীয় পতাকা। ২২ জুলাই, ১৯৪৭, গণপরিষদে জওহরলাল নেহেরু নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি পেশ করেন,

"Resolved that the National Flag of India shall be horizontal tricolor of deep saffron (Kesari), white and dark green in equal proportion. In the center of white band– there shall be a wheel in Navy Blue to represent the Charkha. The design of the wheel shall be that of the wheel (charkha), which appears on the abacuse of the Sarnath Lion capital of Asoka...... The diameter of the wheel shall approximate the width of the white band and the ratio of the width to the length of the flag shall ordinarily be 2 : 3."

জওহরলাল নেহেরুর পেশ করা প্রস্তাব নিয়ে গণপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। সরোজিনী নাইডু আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছিলেন;

"under this flag there is no prints and there is no prince and there is no peasant. There is no rich– there is no poor. There is no privilege– there is only duty sacrifice. Whether we be Hindus or Muslims– Christian– Sikhs Or Zorostrians and others– our Mother India has one undivided heart and one indivisible spirit. Men and women of reborn india– rise and salute this flag. I bid you– rise and salute the flag."

সরোজিনী নাইডু স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ভাবাদর্শ তুলে ধরেছিলেন এবং নব ভারতের নবরূপে জেগে উঠার চিত্রকল্প

"জাতীয় পতাকার সাথে আমাদের আবেগ, স্বপ্ন, ভালবাসা, প্রেম জড়িয়ে আছে। কারণ এ তো আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ত ও হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছে। তাদের অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়েছে জাতীয় পতাকা। জাতীয় পতাকা এক উচ্চতম মানবিক সামাজিক জীবনের প্রতি আমাদের অভিলাষকে সদর্পে ঘোষণা করে। এই পতাকা বহিবার শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে।"

রূপে জাতীয় পতাকাকে দেখেছিলেন। ভারত জাতীয় পতাকা তুলছে সব নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে, সব বিদ্বেষ ও বিভাজনকে তুচ্ছ করে তা তুলে ধরেছেন তাঁর প্রাণবন্ত আলোচনায়। জাতীয় পতাকা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, শপথ ও স্বপ্নের প্রতীক। সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শেষ হতেই গণপরিষদ তুমুল করতালিতে অভিনন্দন জানিয়েছিল ওই মহীয়সী নারীকে।

গণপরিষদের অন্যতম সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ সাদাউল্লাহ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছিলেন, "In my opinion the flag symbolizes the evolution of our aspiratiton– the fulfilment of struggle. Ultimate results of all our sacrifices."

তাঁর মতে পতাকার সাদা অংশ শুদ্ধতার প্রতীক এবং ব্যক্তি জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শুদ্ধতা অর্জন আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য। অশোকের ধর্মচক্র রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্দেশ করে। শাসকের লালসার জন্য শাসন নয়। সবার স্বস্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনই শাসন কর্তাদের মূল লক্ষ্য হবে। পতাকার সবুজ রং নিয়ে তৎকালীন সময়ের সাম্প্রদায়িক শক্তির ওজর, আপত্তি ও গোঁসা ছিল। শেঠ গোবিন্দ দাস, গণপরিষদের অন্যতম সদস্য, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন এই বলে, 'আমি আপনাদের ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের কথা স্মরণ করাতে চাই। ওই সময় আমাদের পতাকার রং ছিল সবুজ এবং ওই পতাকা নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। ওই সময় ওটা শুধুমাত্র মুসলিমদের রং বা হিন্দুদের রং ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের পতাকা ছিল এটা, প্রত্যেকের রং ছিল সবুজ'।

এস রাধাকৃষ্ণান অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছিলেন "The flag links up the past with the present. It is the legacy bequeathed to us by the architect of our library. Those who fought under this flag are mainly responsible for the arrival of this great day of independence for india."

আলোচনার পর গণপরিষদ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পেশ করা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জাতীয় পতাকাকে শুধুমাত্র একদিন স্যালুট করলেই আমাদের দায়িত্ব শুরু বা শেষ হয় না। তিনদিন ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা তুললেই সব দায়িত্বের পরিসমাপ্তি হয় না। জাতীয় পতাকার আদর্শ, ভাবনা ও ঐতিহ্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে না পারলে এবং কর্মে অনুশীলন না করলে যা হয় তা হচ্ছে জাতীয় পতাকার অপমান।

সংবিধানের ৫১(ক) ধারায় জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি নাগরিকদের শ্রদ্ধার উপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি একইভাবে বলা হয়েছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আদর্শকে অনুসরণ ও অনুধাবন করাও প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য, আশা , প্রত্যয়, শপথ ও অঙ্গীকার সংবিধানকে জন্ম দিয়েছে।

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য আহ্বান রাখা হয় জাতির কাছে। একইভাবে দেশবাসীর কাছে বলিষ্ঠ আহ্বান জানানো হয়, দেশের প্রতিটি নগরে প্রান্তরে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে, ঘরে ঘরে তিরঙ্গা ঝান্ডা উত্তোলন করে জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করার জন্য।

জাতীয় পতাকার তিনটি রং তিনটি মহৎ আদর্শ ঃ স্বাধীনতা, সমতা ও ভাতৃত্ববোধের প্রতীক।

জাতীয় পতাকা জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের প্রতীক। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মশাল।

জাতীয় পতাকার সাথে আমাদের আবেগ, স্বপ্ন, ভালবাসা, প্রেম জড়িয়ে আছে। কারণ এ তো আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ত ও হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছে। তাদের অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়েছে জাতীয় পতাকা। জাতীয় পতাকা এক উচ্চতম মানবিক সামাজিক জীবনের প্রতি আমাদের অভিলাষকে সদর্পে ঘোষণা করে। এই পতাকা বহিবার শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে। এই পতাকাকে বুকে আগলে রক্ষা করতে হবে। কারণ আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন ও শপথকে বাস্তবায়িত করার জন্য। জাতীয় পতাকা বহন করার যোগ্যতা ও অধিকার আমাদের অর্জন করতে হবে। পতাকার শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব আমাদের।

আলোচনা

তরুণ প্রজন্ম ও গ্রন্থপাঠে বিপ্লবের কথা

দেবানন্দ ধাম

জটিল। বিষয়টা খুবই জটিল। স্রোতের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে বলতেই হয়, হ্যাঁ, তরুণ প্রজন্ম আর সেরকমভাবে মুদ্রিত বই পড়ে না বা মুদ্রিত বইয়ের প্রতি তাদের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করে সত্যি সত্যিই বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাওয়া যায় বিষয়টি হয়তো তত সরল নয়। তরুণ প্রজন্ম বই পড়ে, হয়তো একটু বেশি রকমই বই পড়ে। নিন্দুকেরা তখন বলবেন, তরুণ প্রজন্ম ই-বুক অর্থাৎ ইলেকট্রনিক বইয়ের দিকে বেশি ঝুঁকে আছে। কথাটা একেবারে ভুল বলেননি। কিন্তু আসল কথা হল ই-বুক কি বই নয়? নাকি অন্য কোনো গ্রহের আজব কোনো বস্তু বা ই-বুক এর জন্য লেখককে লেখালেখি করতে হয় না?

ভারতবর্ষের কথা বা পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার কথাই বলি। আমাদের দেশে যিনি ই-বুক এর পরিষেবা দিয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং ঐ ইলেকট্রনিক সাইটের পিছনে যাঁর মাথা সবচেয়ে সক্রিয় তিনি ব্যাঙ্গালোরের সচিন। তিনি ক্রিকেটের সচীন নন কিন্তু, বইয়ের জগতের বিপ্লব সৃষ্টিকারী সচিন। তাঁর সাইট হল, sachin flipcart.com। তিনি ফ্লিপকার্ট এরও প্রতিষ্ঠাতা। আমরা সবাই flipcart.com-এর কথা জানি। এই ফ্লিপকার্টের সচিনের সঙ্গে একবার আচমকাই ব্যক্তিগতভাবে সামান্য আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল দিল্লি আন্তর্জাতিক বইমেলায় কয়েক বছর আগে। তিনি একজন অসম্ভব মেধাবী তরুণ। বয়স তখনো পঞ্চাশ হয়নি। সারা পৃথিবী জুড়েই তংার বইয়ের পরিষেবা। তিনি ই-বুক পরিষেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই সারা দেশে অসম্ভব জনপ্রিয়। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে তাঁর একটি রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার ও বই ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মূল ক্যাম্পাসে তাদের 'WORLD VIEW' নামে একটি বইয়ের কাউন্টারও বেশ কয়েক বছর চালু ছিল। তাঁরা ই-বুক পরিষেবার মাধ্যমে আপনার অর্ডারের বইটি ন্যূনতম সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে বাড়িতে পৌঁছে দিতেও প্রস্তুত।

> "আচ্ছা, বলুন তো মোবাইল ফোনের ফলে কি আমাদের একটুও উপকার হয়নি? নাকি, সবটাই বাজে! বা কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় তার কি কোনো ভালো প্রভাব পড়েনি? আমাদের ভালোটাকে ভালো বলতে এত দ্বিধা কেন? সব কিছুরই ভালো এবং মন্দ দুটো দিক আছে। এটা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর উপর।"

২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আমাজন ই-কমার্স (amazon.com) কিন্ড্ল (KINDLE) নামক ই-বুক রিডারটি বাজারে চালু করে। এরফলে কম্পিউটারের সহায়তা ছাড়াই ওয়াইফাই (WIFI) ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে হার্ড ডিস্ক স্টোরে গিয়ে যেকোনো বই ডাউনলোড করে পড়া যায়। আমাজনের ওয়েবসাইটে দশ লক্ষের বেশি বই স্টোর করা আছে। কিছু টাকার মাধ্যমে টাইটেল ক্রয় করে তারপর গ্রাহক হয়ে খুব সহজেই মূলত তরুণ প্রজন্মের পাঠকরা এই পদ্ধতিতে প্রচুর বই পড়ছেন এবং এই পরিষেবার সুযোগ নিচ্ছেন। একটি কিন্ড্ল-এ ১৪০০ পর্যন্ত বই মেমোরিতে রাখা যায়— যা নিয়ে তৈরি হয়ে যেতে পারে একটি ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি। প্রয়োজনে মেমোরি ফুল হয়ে গেলে কিছু বই ডিলিট করে রিডাউনলোড করা যায় পরবর্তী কালে সুবিধে মতো। বইগুলো 'ক্লাউড'-এ জমা রেখে দিতে পারা যায়। মুদ্রিত বই পড়ার মতো অনেতগুলো সুবিধেও এই ই-বুক রিডারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনে পড়তে পড়তে একটু আধটু নোট (Note) টাইপ করা যায়। 'বুক মার্ক' দিয়েও রাখা যায়। এমনকি কানো বিশেষ তথ্য হাইলাইট-ও করা যায়। কোথাও বেড়াতে গেলে বা দূরে অফিসের কাজে বা অন্য কিছু, যাই হউক না কেন, অবসর সময় কাটানোর জন্য KINDLE SET সঙ্গে নিয়ে গেলেই হল। বইয়ের বোঝা বহন করার দরকার নেই। কেবলমাত্র পছন্দের বইটি ডাউনলোড করে পড়তে থাকুন। এবং ঝকঝকে টাটকা দুধসাদা বইয়ের

পাতায় মগ্ন হয়ে যান। আসলে বলতে দ্বিধা নেই, ই-বুক পাঠকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

এই যে চারিদিকে এত বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, এর কী কোনো ভালো দিক নেই? একটু খোঁজখবর করলেই জানতে পারবেন এত বড়ো বিশাল মেলায় প্রায় প্রতিটি বইয়ের স্টলেই উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রচুর ভিড় এবং সেইসঙ্গে তাদের নির্দিষ্ট বইয়ের খোঁজখবরের কথা। অন্তত আমার মনে হয়, এটা ঐ আধুনিক 'প্রযুক্তি'র জনপ্রিয়তার জন্য। অর্থাৎ তরুণ পাঠক পাঠিকারা ই-মেল, গুগোল ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বইয়ের অগ্রিম খোঁজ পেয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া বইমেলার মাঠেও বইয়ের খোঁজ খবরের জন্য কোনো কোনো বইমেলায় ইলেকট্রনিক পরিষেবার কাউন্টার থাকছে। আচ্ছা, বলুন তো মোবাইল ফোনের ফলে কি আমাদের একটুও উপকার হয়নি? নাকি, সবটাই বাজে! বা কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় তার কি কোনো ভালো প্রভাব পড়েনি? আমাদের ভালোটাকে ভালো বলতে এত দ্বিধা কেন? সব কিছুরই ভালো এবং মন্দ দুটো দিক আছে। এটা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর উপর। একজন সমাজবিরোধীর হাতে অস্ত্র থাকলে সে হয়তো সেটা মানুষের অনিষ্টের জন্য ব্যবহার করবে। আবার সেটা যদি একজন চিকিৎসকের হাতে থাকে তাহলে সেই অস্ত্র দিয়ে অপারেশন করে তিনি একজন মুমূর্ষু মানুষকে সুস্থ করে তুলবেন। আসলে ব্যবহারকারীর উপর নির্ভর করে একটা সিস্টেমের যাবতীয় সবকিছু।

এত কথা বলার পরও একটা বিষয় হয়তো পরিস্কার হল না। তরুণ প্রজন্ম যদি বই পড়ে, তাহলে কোন্ বই পড়ে বা কী ধরনের বই পড়ে? তারা কি আমাদের তথাকথিত ক্লাসিকের প্রতি আগ্রহ দেখায়? না কি, কেবলমাত্র কেরিয়ার সর্বস্ব পঠনপাঠনেই সারাক্ষণ নিমগ্ন? না, তারা মূলত ইংরেজি বইয়ের প্রতি বেশি আসক্ত বা সহজ করে বললে ইংরেজি ফিকশন। বর্তমানে বেশ কিছু ইংরেজি ফিকশন লেখক তরুণ প্রজন্মের চিন্তাভাবনা এবং তাদের মনস্তত্ত্ব বিচার করে বই লিখছেন। ফলে তাদের বইয়ের একটা বাড়তি আকর্ষণ থেকে যায় ঐ বয়সের পাঠক পাঠিকাদের কাছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি তরুণরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্গিমচন্দ্র, মানিক হয়ে হাল আমলের সুনীল, শক্তি, জয় গোস্বামী বা শ্রীজাতের বইয়েরও খোঁজ রাখেন। কিছু তরুণ আবার আমাদের কালজয়ী ক্লাসিক বইয়ের ইংরেজি অনুবাদেরও খোঁজখবর রাখেন। পেঙ্গুইন ইন্ডিয়ার 'Complete Works of Rabindranath' -এর একটা বড়ো অংশের পাঠক তরুণ প্রজন্ম। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বা 'ঘরে-বাইরে'র ইংরেজি অনুবাদও যথেষ্ট পরিমাণে তরুণদের পাঠের মধ্যে পড়ে।

অন্যদিকে সারা দেশের সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার লেখকদের প্রকাশিত বইয়ের পাঠক চাহিদা নিয়ে আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনো সার্ভে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

হ্যাঁ, সামগ্রিক বিষয়টা হয়তো ব্যাপক সার্ভে বা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। আগের তুলনায় বর্তমানে মানুষের পাঠাগার বা লাইব্রেরি ব্যবহার করে বই পড়ার অভ্যাস কী অবস্থায় আছে? বর্তমানে নানান মিডিয়ার বইয়ের প্রচার ও প্রসারের ফলে 'reading habit' -এর ধরন হয়তো একটু পাল্টেছে। কিন্তু পড়ার একটা সামগ্রিক পরিমণ্ডল দিন দিন ক্রমবর্ধমান— এটা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। পুস্তক পরিষেবার সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত থাকার সুবাদে বলছি 'ই-বুক' এবং 'মুদ্রিত বুক' এর মধ্যে কোনো যুদ্ধ নেই। বরং একটা আর একটার পরিপূরক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। সত্যি করে বললে, অদূর ভবিষ্যতে মুদ্রিত বইয়ের কোনো বিপদ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আরও সহজ করে বললে যতদিন সভ্যতা টিকে থাকবে, ততদিন বই-ও বেঁচে থাকবে। এতে সন্দেহ পোষণ করার মতো কোনো কারণই আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

BIKI ALUMINIUM CENTRE
Prop: Bikash Saha
Mobile: 7005342208/ 9862971769

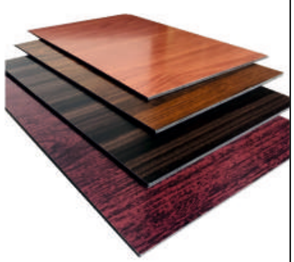
এখানে Interior Design অ্যালুমিনিয়ামের দরজা, জানালা, পার্টিশান, ACP Sheet, Steel Railing, Gypsum Board, Fall Celling ও গ্লাস সুলভমূল্যে বিক্রি করা হয় এবং সকল প্রকার কাজ করা হয়
Nagerjala, Near Modern club, Agartala, Tripura (W)

ভ্রমণ

গ্রেট মাইগ্রেশন

এক জীবন্ত বিস্ময়

জবা চৌধুরী (আটলান্টা)

আফ্রিকায় বেড়াতে যাবার প্রথম সুযোগ এসেছিলো ২০২০ সালের গরমের ছুটিতে। কিন্তু গরমের ছুটি এসে পৌঁছনোর প্রায় দুমাস আগে শুরু হলো কোভিডের তাণ্ডব। শুরু হলো পৃথিবীব্যাপী মানুষের জীবন নিয়ে টানাটানি। গৃহবন্দি জীবনে বেড়াতে যাবার কথা ভাবতেও তখন আতঙ্ক। পরপর বিভিন্ন দেশ থেকে ট্রাভেলের অনুমতি বন্ধ হলো। কাজেই, সেই সময়ের জন্য আফ্রিকা যাওয়াটা স্থগিত হলো। তবে ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই নন-রিফান্ডেবল টিকিটের মেয়াদ ছিল এক বছরের।

তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে, ২০২১ সালে সপরিবারে আমাদের আফ্রিকা ভ্রমণের আবার সুযোগ আসে। কোভিডের ভয়াবহতা তখন অনেকটাই স্থিমিত হয়ে এসেছে। তবে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিধিনিষেধ তখনও কড়াকড়িভাবে ভ্রমণের ক্ষেত্রে জারি রয়েছে। সমস্ত নিয়ম সঠিকভাবে মেনে নিয়ে মে মাসের একত্রিশ তারিখ থেকে ঠিক একমাসের জন্য আমরা সপরিবারে আফ্রিকার তিনটি দেশ— কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া এবং উগান্ডা দেখবো বলে বেড়িয়ে পড়ি। সেই একমাস ছিল তখন পর্যন্ত আমাদের কাছে ভ্রমণের সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা। যাওয়া-আসায় এয়ারপোর্টের কাছাকাছি থাকা ছাড়া শহরের চৌহদ্দির অনেক বাইরে আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে জঙ্গলের মধ্যে একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশে কাটিয়েছি আমরা বাকি সবটা সময়। আজ দুবছর বাদেও সেইসব সাফারির অভিজ্ঞতার স্মৃতি নানাভাবে আমাদেরকে রোমাঞ্চিত করে। রূপোলি পর্দার দৃশ্যের মতো চলমান কিছু ছবি চোখ বন্ধ করলেই যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে — কেনিয়ার মাসাই মারা, আম্বোসেলি — তাঞ্জানিয়ার সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক, গোরংগোরো — উগান্ডার গরিলা ট্রেকিং, শিম্পাঞ্জি ট্রেকিং ইত্যাদি। ওই অসাধারণ একটি ভ্যাকেশনের পর অন্য অনেক ভ্যাকেশনের স্মৃতি তখন ফিকে লাগতে শুরু করেছিল আমাদের কাছে।

মন কেড়ে নেওয়া ওই ভ্যাকেশন আমাদেরকে সত্যি করেই আফ্রিকাকে আরও জানতে উৎসাহী করে তোলে। পরের বছর ভ্যাকেশনে কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে বসে আমার হাজব্যান্ড স্বপন, বছর ঘুরে আসতেই আবারও একটি আফ্রিকা ভ্রমণের প্ল্যান করে ফেলে। সে বার আর কোনো তাড়া নয়। একেবারে ভেবে-চিন্তে রিসার্চ করে সঠিক সময়ে সঠিক কাজের প্ল্যান ঠিক হলো। আর সেই বিশেষ প্ল্যানটি ছিলো পৃথিবীর একটি জীবন্ত বিস্ময় — "গ্রেট মাইগ্রেশন" প্রত্যক্ষ করা।

"মাইগ্রেশন" শব্দটির সাথে কম-বেশি আমাদের সকলেরই পরিচয় রয়েছে। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'মাইগ্রারা' থেকে। যার অর্থ হলো জীবনের প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া। মানুষসহ যে কোনো প্রাণী, যখন তার আশ্রয়স্থল ছেড়ে অন্য কোথাও যায় —তখন এটাই ধরে নিতে হয় জীবনের তাগিদে সে বাধ্য হয়েছে। তাঞ্জানিয়ার সেরেঙ্গেটি আর কেনিয়ার মাসাই মারার বন্য পশুদের মধ্যে এমনি একটি ঘটনা বছরের একটি

নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। যা নিজের চোখে দেখে এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী হবো আমরা নিজেরাও, এটাই ছিল আমাদের প্ল্যান।

তাঞ্জানিয়ার সেরেঙ্গেটি এবং কেনিয়ার মাসাই মারা হল আসলে একই অরণ্যের দুটি অংশ। তাঞ্জানিয়ার উত্তরাংশে রয়েছে এই সেরেঙ্গেটি বনাঞ্চল। ত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এর অবস্থান। ঘন জঙ্গল, বিশাল সব জলাভূমি আর সাভানা ঘাসের প্রান্তর এই অরণ্যভূমিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। মাসাইজাতির মাতৃভাষা হলো 'মা'ন তাদের ভাষা অনুযায়ী সেরেঙ্গেটি শব্দের অর্থ হল "ENDLESS PLAINS" অর্থাৎ উন্মুক্ত বা সীমাহীন সমভূমি। এই সেরেঙ্গেটি অরণ্য সত্তরটি প্রজাতির ছোট বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাঁচশ প্রজাতির পাখির আবাসভূমি। অন্যদিকে, এই অরণ্যের অপর অংশ হল কেনিয়ার অন্তর্গত মাসাই মারা ন্যাশনাল পার্ক। প্রাচীন জনজাতি মাসাই সম্প্রদায়ের নামে এর নামাকরণ। তাদের মাতৃভাষা 'মা' অনুসারে "মারা" শব্দটির অর্থ হল "SPOTTED" অর্থাৎ বহু বিন্দুর সমাহার। এক বিশেষ দূরত্ব থেকে ওই বিস্তীর্ণ প্রান্তরজুড়ে অসংখ্য প্রাণী এবং বিক্ষিপ্ত গাছপালাকে দেখলে মনে হয় ঈশ্বরের তুলিতে আঁকা অজস্র বিন্দু দিয়ে সাজানো এ এক বিশাল শিল্পকর্ম। প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে মাসাই মারার এই নামাকরণ অরণ্যের মাহাত্ম্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

বিকেলের শেষভাগে পৌঁছে গিয়ে মনে হলো আবার দ্বিতীয়বারের মতো সেরেঙ্গেটিকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করলাম। সে এক অনন্য অনুভূতি। যেখানে শুনশান সমতলের অসীমে চলমান প্রকৃতি আর প্রাণের যুগলবন্দি। যতদূর চোখ যায় শুধুই অসীম প্রান্তর। সবশেষে সেই প্রান্তর শুধু ঠায় দাঁড়ানো দিগন্তরেখার গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেয়। আমার চোখ সেই দৃশ্যকে নাম দেয় 'ভালোবাসা'।

গত বছর সেরেঙ্গেটিতে একটানা তিনমাস বৃষ্টি হয়নি। আর এতে করে দুর্ভোগের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। জনজাতিদের পানীয় জলের অভাব থেকে শুরু করে জীবনধারণের প্রতিটি স্তরে তখন জলকষ্ট। মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় জলের ব্যবস্থা করতে পারলেও, বন্য-প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওরা তাই চলতে শুরু করে নতুন জায়গার সন্ধানে।

২০২২ সালের আগস্ট মাস। সেরেঙ্গেটির যে প্রান্ত থেকে সবচেয়ে বেশি পশুরা 'মারা' নদী পেরিয়ে মাসাই মারা আসে খাবারের খোঁজে, আমরা সেই ঠিকানায় ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেছি। পথে মাঝে মাঝেই উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো ধু ধু মাঠে দেখলাম পশুদের জমায়েত। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পশুর নির্বিঘ্ন জমায়েত — অথচ শুধু ওদের চলার শব্দটুকু ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মনে হলো যেন মাঠের নানা জায়গায় আকাশ থেকে ঘনকালো মেঘ নেমে এসেছে। আর সেই চলমান কালো মেঘেরা ভেসে বেড়াচ্ছে মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে।

ধীরে ধীরে ওরা দল বেঁধে মারা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো। আমাদের ড্রাইভার মেশালু গাড়ি থামালো নদী থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তাঞ্জানিয়াতে এটাই নিয়ম। পশুদের রিভার ক্রসিং শুরু হবার আগে গাড়ি অনেকটা দূরে পার্ক করতে হয়, যেন পশুদের চলায় কোনো বিঘ্ন না আসে। কিছুটা সময় যেতেই, হঠাৎ করে প্রথম সারি থেকে পশুদের লিডার জলে নেমে নদী পেরোতে শুরু করে। সাথে চলতে থাকে সেই সারির অন্য পশুরাও। তারপর দ্বিতীয় সারি, তারপর তৃতীয়....! ততক্ষণে ড্রাইভার আমাদের সাফারি ভেহিক্যাল নিয়ে চলে গেছে নদীর খুব কাছে। গাড়ির রুফ তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে লাগলাম একের পর এক দল পশুদের নদী পেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। ওয়েভ রেডিও'র কল্যাণে চারদিকে তখন প্রচুর ট্যুরিস্ট ভেহিক্যাল এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওই অপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে যাচ্ছিলাম আমি। এমন সুশৃঙ্খল মিছিল মানুষের মধ্যেও আমি আগে কখনো দেখিনি। আমার মনে হলো পশুদের এই সুশৃঙ্খল চলাও হয়তো প্রাণীজগতের জীবন্ত বিস্ময়! যেসব পশুরা এই মাইগ্রেশনে অংশ নেয় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো ওয়াইল্ড এবিস্ট, এরা "ন্যু" নামেও আমাদের কাছে পরিচিত। এছাড়া থাকে আন্টেলোপ, বাফেলো আর জেব্রার দল। আফ্রিকার সপ্তম বিস্ময়ের গল্প এদের জীবন নিয়েই চলছে যুগের পর যুগ !

এই মাইগ্রেশন তাঞ্জানিয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ সেরেঙ্গেটির গোরোঙগোরো অঞ্চল থেকে শুরু হয়। আর তা চলতে থাকে উত্তরে কেনিয়াতে অবস্থিত মাসাই মারা রিসার্ভের দিকে। চলতে চলতে আবার একসময় মাসাই মারার অরণ্য পেরিয়ে এরা আবার ফিরে আসে সেরেঙ্গেটির গোরোঙগোরো অঞ্চলে। বছরের পর বছর ধরে চলেছে এই বিস্ময়কর পরিক্রমা। এই চলার পথে তাদের পেরোতে হয় গ্রুমেতি আর মারা নদী। এই নদীগুলো সাধারণত হিংস্র কুমির আর জলহস্তী অধ্যুষিত। মারা নদী ছাড়াও মাসাইমারার অন্য যে নদী টিতে মাইগ্রেশন দেখা যায় সেটি হল—

> "পাথরের বিশাল চাঁই এর ফাঁকে ক্ষুধার্থ সিংহকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি আমরা বহুবার। নদীর জলে ঘাপটি মেরে থাকা কুমিরের দলের উপস্থিতি টের পেয়ে ওয়াইল্ডএবিস্ট-এর দলকে মাঝ নদী থেকে উল্টোদিকে ফিরে যেতেও দেখেছি আমরা। আবার এমনটি দেখেছি নদী পেরিয়ে যাওয়া ওয়াইল্ড এবিস্ট অন্য পাড়ে গিয়ে বুঝতে পেরেছে তার সন্তানটিকে তার সাথে নিয়ে আসেনি।"

তালেক। এইসব নদীতে কুমিরেরা ওঁৎ পেতে থাকে শিকার ধরার জন্য। তাদের হাতে প্রাণ যায় অসংখ্য পশুর।

এই মাইগ্রেশনের অন্যতম কারণ হল জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার দুটি অপরিহার্য শর্ত—খাদ্য এবং পানীয় জল। শুধুমাত্র এই দুটি কারণে যুগ যুগ ধরে চলেছে এই নিরবচ্ছিন্ন পরিক্রমা। যাইহোক, মাসাইমারা অরণ্যাঞ্চলে জুলাই-আগস্টের শেষদিকে এই পশুর দল পৌঁছে যায়। কারণ এই সময় বর্ষার জলে মাসাইমারা সবুজ হয়ে উঠে। তারপর নভেম্বর নাগাদ আবার হাল্কা বৃষ্টি শুরু হলে তারা এগিয়ে চলে দক্ষিণ পূর্ব দিক ধরে। চলতে চলতে ডিসেম্বর নাগাদ ফিরে আসে সেই গোরোঙগোরো অঞ্চলে, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তাদের যাত্রা। আবার শুরু হয় নতুন করে ঘর বাঁধার পালা।

জানুয়ারি থেকে মার্চ—এই তিন মাস মাইগ্রেশনের প্রথমার্ধের সময়কাল। বর্ষার জলের ছোঁয়ায় সবুজ ঘাসে এই সময় ছেয়ে যায় সেরেঙ্গেটির মাঠ-প্রান্তর। ওই সময়টাই পশুদের প্রজনন কাল। ন্যু মায়েরা মাত্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ লক্ষ শাবকের জন্ম দেয়। বাকি পশুদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই নিয়ম প্রযোজ্য। এরপর এই অঞ্চলে বর্ষা বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে নতুন শাবকদের নিয়ে সবাই মিলে রওয়ানা দেয় উত্তর পশ্চিমে গ্রুমেতি নদী উপত্যকার দিকে। অনাগত সন্তানদের পৃথিবীর আলো দেখানোর প্রস্তুতি চলে জুন মাস পর্যন্ত। তাই ওরা ওখানেই থেকে যায় সেই সময়টা। তবে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হাতছানিও এই আদিম অরণ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই মাইগ্রেশন চলাকালীন প্রায় আড়াই লক্ষ ন্যু নানাকারণে প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। আসলে তাঞ্জানিয়া থেকে কেনিয়া পৌঁছোতে এদের অতিক্রম করতে হয় দীর্ঘ আটশত কিমি পথ। এই দীর্ঘ চলার পথে প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি আর অতর্কিত শিকারি পশুর আক্রমণ যেকোনো সময় এই পরিক্রমার মাঝপথেই এদের চলা থামিয়ে দেয় চিরদিনের মতো। এও প্রাকৃতিক নিয়মেরই এক অধ্যায় মাত্র।

মাসাইমারার ঠিক পশ্চিমাংশে 'মারা ত্রিকোণ' বা 'মারা ট্রাইঅ্যাঙ্গেল' হল মাইগ্রেশনের পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মাসাইমারা রিসার্ভ এর তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলটি। এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৫১০ বর্গ কিলোমিটার। মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের স্থানগত অনন্যতা লক্ষ্যণীয়। কারণ সেরেঙ্গেটি থেকে মারাতে আসা এবং মারা থেকে সেরেঙ্গেটিতে ফেরা, মাইগ্রেশনের এই দুই যাত্রাপথেই এই অঞ্চলটিকে অতিক্রম করতে হয়। তাই মারা ত্রিকোণ বা মারা ট্রাইঅ্যাঙ্গেল গ্রেট মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে এক দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওই অঞ্চলকে ঘিরে মারা নদী এক অদ্ভুত সুন্দর প্রাকৃতিক সীমানা সৃষ্টি করে একে ঘিরে রেখেছে। সাভানা ঘাসের ঘন তৃণভূমি, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন জলাভূমি আর আগ্নেয়গিরির ছোট-বড় অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই অঞ্চল। মাসাই মারা ন্যাশনাল পার্কের মূল প্রবেশদ্বার থেকে বহুদূর এর অবস্থান। এই অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতার কারণে এই অঞ্চলে পশুদের আনাগোনাও ওখানে অনেক বেশি।

এই পরিক্রমার সবটাই যে শান্তিপূর্ণ, তা কিন্তু নয়। খাদ্য এবং খাদকের জীবন-মরণের নিপুণ খেলাটিও এরই মধ্যে চলতে থাকে। পাথরের বিশাল চাঁই এর ফাঁকে ক্ষুধার্থ সিংহকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি আমরা বহুবার। নদীর জলে ঘাপটি মেরে থাকা কুমিরের দলের উপস্থিতি টের পেয়ে ওয়াইল্ডএবিস্ট-এর দলকে মাঝ নদী থেকে উল্টোদিকে ফিরে যেতেও দেখেছি আমরা। আবার এমনটি দেখেছি নদী পেরিয়ে যাওয়া ওয়াইল্ড এবিস্ট অন্য পাড়ে গিয়ে বুঝতে পেরেছে তার সন্তানটিকে তার সাথে নিয়ে আসেনি। সে তখন পাগলের মতো ছুটে আবার নদী পেরোয়। আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড যখন পশুদের প্রতিটি চলাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলো একের পর এক—নিজে মা বলেই হয়তো সেই অনুভূতিগুলো যন্ত্রণা হয়ে বুকে বাজছিলো। কিন্তু যতই আমাদের খারাপ লাগুক, এটাই হলো 'সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট' এর বিখ্যাত থিওরি। যাইহোক, এ কথাটি না উল্লেখ করলেই নয় — ২০২২ সালে আমরা সেরেঙ্গেটি থেকে ছয়বার গ্রেট মাইগ্রেশনের রিভার ক্রসিং দেখেছি। যা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে। এটা ছিল ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের একাগ্রতা আর অবিচল ধৈর্যেরই ফল। এই ক্রেডিটের সবটা, ছবি তোলায় প্যাশনধারী আমার হাজব্যান্ডের প্রাপ্য। যাইহোক, অভিজ্ঞতার এই স্মৃতি-সম্ভার আমাদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকাল।

এই গ্রেট মাইগ্রেশন বিস্ময় তো বটেই। কিন্তু সেই সাথে আফ্রিকার অর্থনীতিতেও রয়েছে এর বিশাল অবদান। সারা পৃথিবীর প্রকৃতিপ্রেমী দর্শকদের সাথে সাথে আলোক চিত্রশিল্পী বা ফোটোগ্রাফারদের কাছে আফ্রিকার আরণ্যক জীবন এবং মাইগ্রেশন — দু'টোই স্বপ্নস্বরূপ আকর্ষণের। বন্যপ্রাণীদের জীবনের এই সংগ্রামের সাথে আজ জড়িয়ে রয়েছে ট্যুরিজম থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের আফ্রিকান মানুষের বাঁচার রসদ। এই বিস্ময় সার্বিক অর্থে তাই অনন্য।

এই লেখাটি যখন শুরু করেছি, সেই সময়েই (সেপ্টেম্বর, ২০২৩) আমি আর আমার হাজব্যান্ড তৃতীয়বারের মতো কেনিয়াতে ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি করতে চলে যাই। তিন সপ্তাহের ছুটিতে আবারও আমরা দু'বার গ্রেট মাইগ্রেশনের রিভার ক্রসিং উপভোগ করি। তবে এবার তাঞ্জানিয়া থেকে নয়, এবার সেটি উপভোগ করলাম কেনিয়ার সাইড থেকে। সবশেষে এটাই বলবো, এই অভিজ্ঞতা লিখে বা বলে বোঝানোর নয়, শুধুই অনুভবের।

কবিতা

শুরু থেকে শেষ

শংকর কুমার ঘোষ

রতন মণি রতন মণি—মার বুকে জড়িয়ে তুমি
সবার আদর সবার প্রিয়— তোমায় নিয়ে টানা টানি
চোখের মণি রতন মণি।।
হাবুর দিয়ে চলতে শেখা—একটুখানি থমকে দেখা
কিছু হলেই কাঁদার ভান— বোঝাও তুমি অভিমান
আমি তা সবই জানি— ওরে আমার সোনা মণি।।
একটু খানি আওয়াজ তোমার—আলতো আলতো ডাক শুনি
মাম্মা-পাপা ডাকেতে ভরে উঠে হৃদয় খানি
আমার মানিক আমার মণি।।
ঐ যে তোমার দাঁত দেখা যায়— দাঁড়িয়ে তুমি নিজের পায়
হেলে দুলে চলছ তুমি— ছুটবে তুমি দুরন্ত জানি
এটা ওটা টানবে তুমি—আমার সোনা আমার মণি।।
হাঁটি হাঁটি পা পা খাবারেতে তোমার না
সবটাতেই নাক টানি— দুষ্টু তুমি সবই জানি
রতন মণি রতন মণি।।
এবার বইয়ের ব্যাগ কাঁধে তোমার — স্কুলেতে তৈরি যাবার
পড়াশুনার আওয়াজ শুনি— বড় হবার অঙ্ক গুনি
এবার পূর্ণ বালক তুমি—তুমিই কি রতন মণি।।
দুরন্ত ছুটন্ত বালক— ছিঁড়ে নিতে পাখির পালক
দুয়ারে বসে ঘরে ফেরার প্রহর গুনি
তুমি যে আমার হৃদয় জানি— রতন মণি।।
গোঁফ যে একটু ঐ দেখা যায়—মন যে তোমার অন্য চায়
দেহে মনে রণি রণি— ভেতর থেকে উঠছে ধ্বনি
শুনতে যে চায় উলুধ্বনি—সোনা মণি সোনা মণি।।
ধীরে ধীরে চিন্তা বাড়ে—দায়িত্ব যে আসছে ঘাড়ে
টানতে হবে সংসারের ঘানি— চলা তোমার বেগ তুফানী
তোমায় যে আপন মানি— ওরে ওরে রতন মণি।।
বিয়ের টোপর মাথায় যে আজ – সামনে তোমার বড় সমাজ
শুরু তোমার বাঁচার কাজ—হিসেব যে আজ হাতে গুনি
ওরে বাবা—ওরে মণি।।
হঠাৎ শুনি বাবা ডাক— চুলেতে ধরেছে পাক
ভুলে গেছো তুমি সোম বা শনি
চলার পথে কদম গুনি—রতন মণি রতন মণি।।
সুঠাম দেহ জীর্ণ কায়—কোথায় গেল সেদিন হায়
কানেতে আজ কম শুনি—অসার যেন দেহ খানি
আমার বাবা—আমার মণি।।
একি! তুমি যে আজ চারের কাঁধে—চিরবিদায় অনেক বিবাদে
তোমায় ভুলে যাবে এটাও জানি—বিদায় তুমি ধরণীর মণি
র-ত-ন মণি ন-য়-ন মণি।।

কবিতা

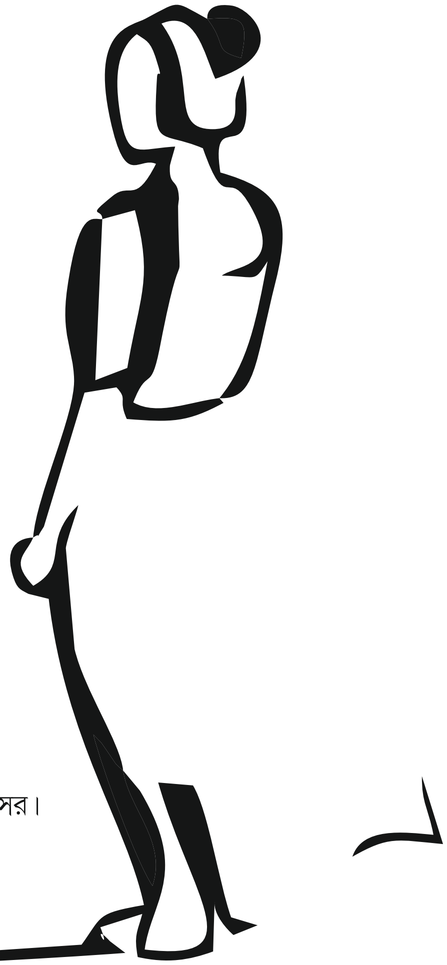

বিভাজন

দিপ্সি দে

সমস্ত ঘর অন্ধকার হলে,
আরও স্পষ্ট হয় তোমার চোখ
একটু একটু করে শরীরের ক্লান্তি ধুয়ে দিয়ে,
চোখের জল নেমে যায় নাক পেরিয়ে,
নদীগুচ্ছের বিশ্বস্ত ঠিকানায়,
প্রেম বন্ধক রেখে,
সমস্ত ঘরে অন্ধকার ছড়িয়ে, আলো তৈরি করে ক্রসিংজোন।
এরপর,
চেঁচিয়ে উঠে পাখি।
চোখ বন্ধ করে এগিয়ে যেতেই
ফেলে আসা রাস্তার মোড়ে তুমি একা।
শরীরের গন্ধ মাখে ধুলো আর বিছানার গড়াগড়ি খায় রোদ বিকেলের গল্পের আসর।
পাখি ফিরে যায় নিজস্ব ঠিকানায়
মৃত শ্বাসের হিসেব শেষে গোপনে,
আমি বাড়ি ফিরি একা।

নারী দশভূজা

মনচলি চক্রবর্তী

নারী তুমি দশভূজা মহামায়া
স্নেহ, মমতা, ভালোবাসায় পূর্ণ তোমার কায়া
নারী তুমি গৃহিনী, তুমিই গর্ভধারিণী
জগৎ সংসার, গৃহ, সন্তান, তুমিই রক্ষাকারিণী
যদিও সদাই সবে ভাবে তাচ্ছিল্যে তুমি অতি সাধারণ
প্রমাণ করেছো বারংবার তুমি অসাধারণ চিরন্তন
সেই নারীই হয় প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, বঞ্চিত
প্রতিবাদে গর্জে উঠো, উগড়ে দাও অভিমান যত সঞ্চিত
নারী তুমি ভুলতে দিও না এই জগৎ সমাজকে
তুমি প্রকৃতি, তুমিই শক্তি, মানবে সবাই নতমস্তকে।।

কবিতা

সমর্পণ

শান্তনু রায় বর্মণ

তুমি আমার যাবতীয় নেশা
তোমার লজ্জা, কারুকার্য হাতে রেখো।
তোমার চোখ, তোমার ঠোঁট, তোমার
সবেতে আমার নেশা,
এই সব চিত্র মনেতে বুনি বলে—
তুমি আমাকে জোনাকি মশালে ছুঁড়ে দিও না।
মরমি গানে চোখ দুটি লাল জবা বলে
আমাকে মিশিয়ে দিও না কারবারিতে।

রাধার অন্তঃসলিলা ফাগুনের গান
মন্দিরে আজও বাজে অশ্রুস্নাতে।
উদাসীন টানে ঢাকবে না আমায়
জীবনের নাট্য প্রান্ত দ্বারেও!

তোমার অলৌকিক ফলবর্তী বাক্য শোনা,
নিভৃতে শয়নে তোমাতে মিশে যাওয়া
এ যেন কাশ ফুলে বিছানায় সঙ্গমে মত্ত হওয়া
আর যখন কোনো এক নক্ষত্রের আকাশে মৃত্যু হবে।

এক দুই তিন করে করে
মনের অজানায় তোমাতে পর্যাবৃত্ত নেশা হলো, কখন
লোভে না, লঘু মরীচিকায়
সে উত্তর খোঁজ করি আমার ভেতরের দাসত্বে মাঝে।

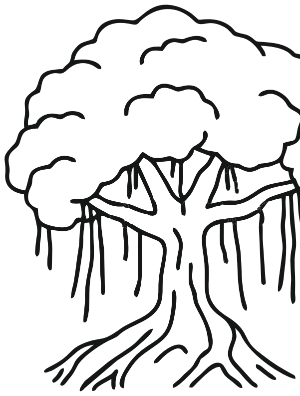

মিশে গেছে

মৌসুমী কর

উঠোনের দক্ষিণ কোণের
বটগাছের শিকড়টা মিশে গেছে
আমার প্রপিতামহের
হাড়ের সঙ্গে।
আমি প্রতিদিন বিকেলে
গাছের নিচে গিয়ে বসি
কান পেতে শুনি
পূর্বপুরুষদের হৃদয়ের স্পন্দন
সারাটা পৃথিবী তোলপাড় তখন
কোনো ঋদ্ধ শ্রাবণ
চোখের জল মোছাতে পারে না।

ফানুস

অসীম কর

তোমার মনের ঘরে যে পুরুষের বাস
সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়!
অথবা কোন এক পরিত্যক্ত দ্বিপ্রহরে তোমার
বুকে বৃষ্টি নামিয়ে
জবুথবু তোমায় শুকনো এই শহরে একা করে দেয়
তুমি কী অনন্তকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবে।
নাকি দমবন্ধ ঘরের সিলিং-এ তাকিয়ে থাকবে অষ্ট প্রহর।
তোমার কী কখনো শ্রাবণে ভিজতে মন চাইবে না!
ফ্যাকাশে মনটাকে ধুয়ে মুছে আবারো ফূর্তিতে
গা ভাসাতে ইচ্ছে করবে না বুঝি।
অনিয়ম করে উড়ে যাওয়া কোন এক ফানুসের খাতিরে,
একটু নিয়ম না হয় ভাঙ্গলেই তুমি।

কবিতা

তিন ছড়া

ঋষভ চক্রবর্তী (চতুর্থ শ্রেণি)

(১)
আমরা যেমন হাসি কাঁদি
বলি প্রাণের কথা,
প্রাণের সাড়ায় তেমনি নাচে
বৃক্ষ তরুলতা।
এই কথাটি প্রথম কে গো
জানান দশদিশ্,
এই বাংলার বিজ্ঞানী সে
নামটি জগদীশ।।

(২)
ছুটি, ছুটি, ছুটি
মনের খুশি রয়না মনে
হেসেই লুটোপুটি।
শেষ হলো ভাই পড়ার তাড়া
অঙ্ক কাটাকুটি,
দেখবো না আর অঙ্ক স্যারের
রক্ত আঁখি দুটি।

(৩)
মাস্টার মহাশয় যার রোজ কান ধরে,
সমাস কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করে,
ইতিহাস পিরিয়ডে ছোটে যার ঘাম
নিশ্চই ভুলেছে সে বাবরের নাম।
ভূগোলেতে আছে যার সমস্যা ভার,
জানে না যে ফুজিয়ামা নদী না পাহাড়।

বিশ্বকবি

ড. গোপী নন্দন দে

ওগো রবি তুমি বিশ্বের কবি
তুমি তো বিশ্ববরেণ্য,
বাঙালির ঘরে জন্মেছ তুমি,
বাঙালিকে করেছ ধন্য।

বৈশাখের খরায় প্রবল তেজে
হয়েছ আবির্ভূত।
রবি হয়ে তুমি ভারতের আকাশ
করেছ আলোকিত।
সে আকাশে আজও রয়ে গেছে আলো,
শুধু তোমারই জন্য।
বাঙালির ঘরে জন্মেছ তুমি,
বাঙালিকে করেছ ধন্য।

হে মহামানব, তুমি শিল্পী,
অনবদ্য তোমার সৃষ্টি!
তোমার রচনায় মজিলে একবার
ফেরানো যায় না দৃষ্টি!
সাহিত্যের সৌরভ ছড়িয়েছো বিশ্বজুড়ে,
তুমি বিশ্বকবি।
ভারতের গৌরব বাড়িয়েছো তুমি,
তুমিই মোদের রবি।
শ্রাবণের ধারায় মিলিয়ে গেলে তুমি
লেখনি বন্ধ করে,
তোমারই মত জন্মিবে কি কেউ
আবার বাঙালির ঘরে?
তোমাকে ছাড়া আজ মোদের হৃদয়
ব্যথায় ব্যথায় পূর্ণ।
বাঙালির ঘরে জন্মেছ তুমি
বাঙালিকে করেছ ধন্য।

গল্প

দর্পচূর্ণ

পারিজাত দত্ত

চেম্বারের বাইরে রোগীর ভিড় দেখে একটু দমে গেল সুরজিৎ। এখন রাত ৯ টা। এখনও গিজগিজ করছে রোগী। অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে ক্লান্ত রোগী ও আত্মীয়-পরিজনদের চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। এদের টপকে ডাঃ ছেত্রীকে দেখানো সম্ভব নয়, সুরজিৎ জানে। শহরের ব্যস্ততম চিকিৎসক হলেন ডাঃ অনুপ ছেত্রী। তিনি নেপালি, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে আগরতলায় থাকেন। ঝরঝরে বাংলা বলতে পারেন। সুরজিতের সঙ্গে পরিচয় পত্রিকার দৌলতে। সুরজিৎ রায় ত্রিপুরার এক স্বনামধন্য সাংবাদিক। একডাকে চেনেন সবাই। তার বাইলাইন স্টোরি নিয়মিত ছাপা হয় রাজ্যের প্রথম সারির দৈনিকে।

ডাঃ ছেত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে দু'মাস আগে বুকিং করতে হয়। ইএনটি স্পেশালিস্ট হিসেবে তাঁর সুনাম রাজ্যেই শুধু নয়, বহির্রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষটি চিকিৎসক হিসেবে যেমন, মানুষ হিসেবেও তেমনি বড়মাপের।

মেয়েটার ইদানিং কানে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। দিপ্সি, তার স্ত্রী, পত্রিকা অফিস থেকে ফেরার পরই বলেছিল, "রিঙ্কিকে একটু ডাক্তার দেখাতে হবে।"

সে কেন জানি না ততটা গুরুত্ব দেয়নি, অনেক সময়ই সুরজিৎ এমন করে। কিছু কিছু বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। কোনও কোনও বিষয় গায়েই লাগায় না। পর দিন রাতে দিপ্সি রীতিমতো হামলে পড়ল, বলল, "তুমি কি গো? মেয়েটার সমস্যা তুমি পাত্তাই দিলে না। সন্তানের দুঃখ-কষ্টে বাবা এমন নিস্পৃহ থাকতে পারে বুঝি?"

এরপর তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতেই হয়। অপরাধবোধে ভুগতে-ভুগতে ফোন করল সুরজিৎ। ডাঃ ছেত্রী অ্যাপয়েন্টমেন্ট এককথাতেই দিয়েছেন। তবে বলেছেন, "যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিয়েছেন, তাদের দেখে তারপর দেখব। অসুবিধে হবে নাতো? ৯ টায় চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করতে হবে হয়তো।"

সেই নয়টায় রিঙ্কিকে নিয়ে ডাঃ ছেত্রীর চেম্বারের সামনে এসে দেখল সুরজিৎ রোগীদের লম্বা লাইন। রিঙ্কিকে নিয়ে চেয়ারে বসার আগেই ডাক্তারবাবুর অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম?"

রিঙ্কি জবাব দেবার আগেই সুরজিৎ বলল, "ঋতুপর্ণা রায়।"

"এই নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। দেখানো যাবে না আজকে।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে সুরজিৎ বলল, "দেখানো যাবে। আজই। রিঙ্কি বসে পড়।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অ্যাটেনডেন্ট। সুরজিৎ সদর্পে বলল, "কথা হয়েছে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। বুঝলেন? কতজন রয়েছেন আর?"

অ্যাটেনডেন্ট গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "সাত।"

সুরজিৎ চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলো। মুখে যেন বিশ্বজয়ের ছাপ। অন্যান্য রোগীদের অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এখন। মানুষ দু'মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখাতে হিমশিম খান। আর সুরজিৎ দিব্যি এসে দেখিয়ে চলে যাবে!

এই হয়। যোগাযোগ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভীষণ দামি। সর্বকালেই। অপেক্ষমান রোগীদের কারো কারো বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সুরজিতের মুখটা অহংকারী-অহংকারী হয়ে উঠল এখন। হঠাৎ তার চোখ পড়ল রিঙ্কির দিকে। অদ্ভুতভাবে তাকেই জরিপ করছে যেন!

"কিছু বলবি?" সুরজিৎ জিজ্ঞেস করল।

রিঙ্কি ফিসফিস করে বলল, "এভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে নেই। তুমি কি ক্ষমতা দেখালে? প্রথমেই লোকটাকে বুঝিয়ে বলতে পারতে যে তোমার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথা হয়েছিল। তুমিই তো বলো, ব্যবহার-ই আসল।"

লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে যেতে সুরজিৎ অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল।

আলোচনা

ভূমিকম্প !

ভূমিকম্পরোধী বিল্ডিং-এর নিয়মাবলি কিছু সতর্কতা

ড: জয়ন্ত পাল

ভূমিকম্প শব্দটি খুবই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এবং আমরা সবাই এর সাথে খুবই পরিচিত। ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যদিও এই প্রজন্মের ত্রিপুরাবাসীর নেই, কিন্তু যদি সংবাদপত্র, টিভি,ইন্টারনেটে একটু চোখ বুলাই তবে ভয়াবহতা কী জিনিস সেটা বুঝতে পারি এবং এই ভয়ঙ্কর স্মৃতি অনেকে সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়ায়।

আসলে ভূমিকম্প একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তীব্রতা একটু বেশি হলেই সেটা অনুভূত হয়। ত্রিপুরায় গত ১২৩ বছরে তীব্রতর ভূমিকম্প হয়েছিল জুলাই ৮, ১৯১৮ সালে, তীব্রতা ছিল ৭.১। পুরাতন আগরতলায় রাজবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ১২ জুন বিধ্বংসী ভূমিকম্পে। তীব্রতা ছিল ৮.৭। ভূমিকম্প পরবর্তী সময় বর্তমান আগরতলায় ১৮৯৯-১৯০১ সালে মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য দ্বারা নির্মিত হয়েছিল উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ।

যে সমস্ত বিধ্বংসী ভূমিকম্প এই ভারতীয় উপমহাদেশে হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ— ১৯০৫ এর কাংরা -ভূমিকম্প যার তীব্রতা ছিল ৭.৮ এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। ১৯৫০ এর আসাম-ভূমিকম্প যার তীব্রতা ছিল ৮.৬ এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ১৯৯৩-এ মহারাষ্ট্র-ভূমিকম্প যার তীব্রতা ছিল ৬.২ এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। ২০০১-এ ৭.৭ মাত্রার গুজরাট-ভূমিকম্প যেখানে মৃত্যু প্রায় ১৩ হাজার-আহত দেড় লাখের উপর এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বিপুল। ২০০৫ এর কাশ্মীর ভূমিকম্প যেখানে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৮৬ হাজার এবং তীব্রতা ছিল ৭.৬।

আসলে পৃথিবীটা কয়েকটা প্লেটের উপর ভাসছে। প্লেটগুলিকে বলে টেকটনিক প্লেট। এই প্লেটগুলির নিচে রয়েছে তরল লাভা। লাভার উপরেই ভাসছে প্লেটগুলি। প্লেটগুলি একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে ভূমিকম্পের সৃষ্টি। এ প্রবল শক্তি বেরিয়ে আসার রাস্তা খোঁজে। এর ফলেই হয় ভূমিকম্পের অনুভব। তবে এই ধরনের কম্পনে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হবে, তা নির্ভর করে ওই অঞ্চলের জনঘনত্ব এবং কম্পনের উৎসস্থল ভূপৃষ্ঠের কতটা গভীরে তার উপর।

ভারতে হিমালয়ের পাদদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। হিমালয় হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভূতাত্ত্বিক ফাটল। ছোটোখাটো ভূমিকম্প কিন্তু এখানে নিয়মিতভাবে অনুভূত হয়। এটাই সংকেত যে বড় বিপদ আসন্ন, বিশেষ করে হিমালয় অঞ্চল-এ।

ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুযায়ী ভারতকে চারটা বলয়-এ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জোন-২, জোন- ৩, জোন- ৪ এবং জোন- ৫। জোন- ৫ হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এই জোনের মধ্যে রয়েছে। তাই মাঝে মধ্যেই এই অঞ্চলের কোনও না কোনও রাজ্যে কম্পন অনুভূত হয়।

যদিও প্রকৃতির উপর কারো কোন হাত থাকে না কিন্তু প্রকৃতির রোষ কমানোর জন্য কিন্তু মানুষ অনেক কিছু করতে

পারে। একটা কথা প্রচলিত যে ভূমিকম্প মৃত্যুর কারণ নয় কারণ বিল্ডিং।

সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প অনুভূত হয় জাপানে। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি জাপানে খুবই কম হয়। এর কারণ ওরা বিভিন্ন আধুনিক-প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে এবং সেই আধুনিক-প্রযুক্তির প্রয়োগও সেখানে অনেক বেশি।

সম্প্রতি (২০২৩) তুরস্ক এবং সিরিয়াতে যে সেভেন পয়েন্ট এইট মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে তা অনেকটাই চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট যে নির্মাণে ঠিকমতো বিল্ডিং-রুল অনুসরণ না করলে কী হতে পারে। গত দু'দশকে যে সব ভূমিকম্প ঘটেছে, মৃত্যুর নিরিখে প্রথম পাঁচে উঠে এসেছে এটি। বিধ্বংসী ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া তুরস্কে উদ্ধারের কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভারত 'অপারেশন দোস্ত' এর মাধ্যম-এ।

২০০১ এ গুজরাট-ভূমিকম্পে যেখানে বেশিরভাগ বাড়ি নিয়ম মত বানানো হয়নি সেখানেই যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু, যে সমস্ত বিল্ডিং ভারতীয়-মানক-এর নিয়মমতো বানানো হয়েছে সেখানে ক্ষয়ক্ষতি খুবই কম হয়েছে। গুজরাট ভূমিকম্পের পর প্রশাসন কিছু সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে যেমন অনতিবিলম্বে সেখানে নিউ- টাউন- প্ল্যানিং প্রবর্তন করা হয়েছে, যেখানে চওড়া রাস্তা কিংবা আপৎকালীন নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত্রিপুরা জোন ফাইভে সবচেয়ে মারাত্মক ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাতে অবস্থিত। ভূমিকম্পে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা এখানে ভারতের অনেক জায়গা থেকে অনেক বেশি। সুতরাং বিল্ডিং-রুল ফলো করার বাধ্যবাধকতা আমাদের অনেকটাই বেশি। যদিও ভারতীয় মানকে 'IS-১৮৯৩' কিভাবে ভূমিকম্প রোধক বাড়ি বানানো যায় সেটার দিক নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে।

ভূমিকম্পরোধী বাড়ি বানানোর জন্য 'IS-১৮৯৩' যে নিয়মাবলি দিয়ে দিয়েছে সেটা বিভিন্ন সময় হওয়া ভূমিকম্প পরিসংখ্যানের উপরে নেওয়া হয়েছে। ভূমিকম্পরোধী বিল্ডিং এর মানে এই নয় যে- যে কোন তীব্রতার ভূকম্পন সেই বিল্ডিং সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে মাঝারি-ভূমিকম্পের কারণে সেই বিল্ডিং এর কোন কাঠামোগত ক্ষতি না হয় এবং তীব্র - ভূমিকম্পের কারণে যাতে সম্পূর্ণ পতন না হয়। এই ভারতীয় মনে সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে আইআইটি রুর্কি, আইআইটি বোম্বে, আইআইটি কানপুর, ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার। IS ১৮৯৩-কে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এর মধ্যে ভাগ- ১ জেনারেল প্রভিশন এন্ড বিল্ডিং যেকোনো বিল্ডিংয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এছাড়াও বিশেষ ধরনের বিল্ডিং এর নিয়মাবলি ভাগ -২ থেকে ভাগ- ৫ পর্যন্ত রয়েছে।

আজকের দিনে যখন আমাদের নির্মাণ -কার্যকলাপ খুবই বেড়ে গেছে সুতরাং তার প্রয়োগ এবং প্রাসঙ্গিকতাও অনস্বীকার্য। যদিও পৌরপ্রতিষ্ঠান, নগরোন্নয় দপ্তর, রাজ্য-প্রশাসন এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা এ ব্যাপারে সক্রিয় এবং সচেতন। কিন্তু আমার আপনার বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে নিজেদের যথেষ্ট সচেতন থাকাটাও খুব জরুরি। যেহেতু বাড়িতো আর বারবার বানানো সম্ভব নয়!

24x7 AYA HOME SERVICE CENTRE
D. Chakraborty

Head Office :
Nagerjala, Bhattapukur, Near Modern Club
Agartala, Tripura (W)

Branch :
Udaipur, Ramesh Chowmuhani,
Sunil Market, Room No.54

DOCTOR
NURSE (নার্স)
AYA (আয়া)
at Home

Rend Facilities:
- Oxygen Cylinder
- Concentrator
- Cardiac Monitor
- Ambulance

Contact Us
7005683624/ 9774515167
9774453828

All Medical Facility
Available (Injection, Saline)

N.B. :
1. Old Age & Baby care available
2. Covid Positive Home Quarantine Patient Care.

সংস্কৃতি

ত্রিপুরা নৃত্যকলা চর্চা

ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী

ত্রিপুরায় রাজ আমল থেকেই নৃত্যকলার চর্চা হয়ে আসছে। সংস্কৃতিবান ত্রিপুরার মহারাজারা নৃত্যকলার রসে শুধু নিজেরাই নিমগ্ন ছিলেন না, রাজ অন্দরের নারীদেরও নৃত্যচর্চায় প্রচণ্ড উৎসাহ প্রদান করতেন। বাইরে থেকেও অনেক নৃত্যশিল্পী সেসময়ে রাজদরবারে নৃত্য প্রদর্শন করতে আসতেন।

এছাড়া ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে মণিপুরের রাজ পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর বহু মণিপুরি সম্প্রদায় এসে ত্রিপুরায় বসবাস করতে শুরু করেন। এ সম্পর্কের সূত্রে মণিপুরি নৃত্যের চর্চাও শুরু হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিপুরায় আগমন এবং যোগাযোগ যা পরবর্তীকালে নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে এবং ত্রিপুরায় নৃত্যচর্চায় একটি নূতন ধারা সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতা পূর্ব থেকে ও স্বাধীনতা উত্তরকালে ত্রিপুরায় নৃত্যচর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় এবং সরকারিভাবে নৃত্যচর্চা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে মণিপুরি, কথক এবং পরবর্তী সময়ে ভরতনাট্যম নৃত্যের চর্চা শুরু হয়ে যায়। এছাড়া রবীন্দ্রধন্য ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের গানের সঙ্গে নৃত্য, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ইত্যাদি দিয়ে প্রভূত চর্চা শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে নজরুল গানের সঙ্গে নৃত্য এবং নৃত্যনাট্যের জোয়ার বইতে শুরু করে।

বর্তমান সময়ে আরও দুটি শাস্ত্রীয় নৃত্য যথা—ওড়িশি এবং কুচিপুড়ি নৃত্যের চর্চাও শুরু হয়।

ত্রিপুরায় নৃত্যকলার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হল—প্রথমদিকে রাজ অন্দর মহলের নৃত্যচর্চা, পরের দিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নৃত্যচর্চা, এর বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় নৃত্যচর্চা, সরকারি প্রচেষ্টায় নৃত্যচর্চা।

এর বাইরে সমগ্র ত্রিপুরাজুড়ে বয়ে চলেছে ত্রিপুরা উপজাতীয় নৃত্যকলা যা প্রথম অবস্থায় অনেকটা সুপ্ত থাকলেও নানারকম পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের ফলে এখন তা প্রবলভাবে বহমান। তাছাড়া অনুপজাতিদের লোকনৃত্য ত্রিপুরার নৃত্যকলার অন্যতম অংশ।

এভাবেও বলা যায় যে, ত্রিপুরার নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে একদিকে উপজাতি লোকনৃত্য ও অনুপজাতি লোকনৃত্যচর্চা, অন্যদিকে শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা এবং রবীন্দ্র নৃত্য, নজরুল নৃত্য। এছাড়া নানা প্রকারের সৃজনশীল নৃত্যনাট্যের চর্চাও লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে ত্রিপুরায় নৃত্যকলার চর্চার প্রসার অনেক বেড়ে গেছে। ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য ও অন্যান্য নৃত্য ভারতে এবং ভারতের বাইরে প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছে। ত্রিপুরার নৃত্যকলা জাতি-উপজাতির মেলবন্ধনে সুদৃঢ় হয়ে উঠুক এবং ত্রিপুরার নৃত্যকলা ভারত তথা বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করবে — এই আমাদের প্রত্যাশা।

গল্প

আফ্‌শোস

নির্মল অধিকারী

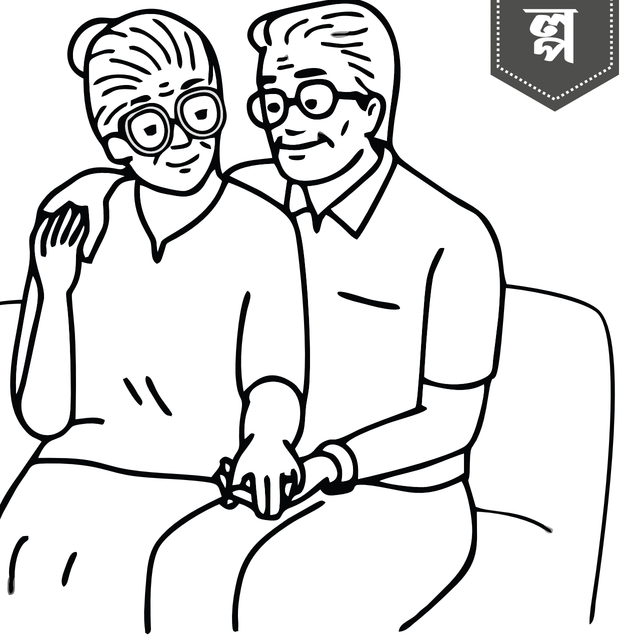

বাষট্টি পেরিয়ে অরিন্দম বাগচী প্রশ্নটার সোজা উত্তর দিতে পারলেন না। “জীবনে কি আফ্‌শোস আছে”—স্ত্রীর উত্তর এড়িয়ে গিয়ে চুপ রইলেন। না হলে, সকালটা ভালো কাটত না।

ঘুম থেকে উঠেই শিউলি বাগচী, বক্‌বকম্‌ শুরু করে। মাঝেমধ্যেই অরু, নীরব থাকলেই যেহেতু নিস্তার পাওয়া যায়, তা-ই করেন।

আজ শনিবার। মিউনিসিপ্যালিটির সখ্যতায় রাস্তায় প্রস্রাবাগার স্থানান্তরিত হয়েছে। ট্রাফিক জ্যামে ইদানীং মোটরস্ট্যান্ডে এক-দু'মিনিট গাড়ি দাঁড়াতেই হয়। হর্ন বাজছে, সামনে রোগা- শেষ জীবনে বাতি নিভু নিভু করছে একজন ট্রাফিক কনস্টেবল। ঘুষ খেতে খেতে পকেট যে ছিঁড়ে গেছে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে চারদিক থেকে আসা গাড়ি-বাইক সামলাতে হচ্ছে। অভিজ্ঞতাশূন্য, বিচার বুদ্ধিহীন এ বৃদ্ধ কনস্টেবল ঠিক পারছেন না। দূরে কালো চশমা পরিহিত বছর পঁচিশের ভলান্টিয়ার তামশা দেখছে। আজকাল প্রায়ই রোদচশমা পড়ে ওরা হিন্দি ফিল্মকে ফলো করছে। বেচারাদের স্বপ্নভঙ্গ কবে হবে, কে জানে! যেটা বলা হচ্ছিল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি বা বাইক থেকে উগ্র অ্যামোনিয়ার গন্ধ, অবশ্যই হালে খোলা আকাশের প্রস্রাবখানা থেকে নিতেই হবে। ওটা এখন মোটরস্ট্যান্ডের শোভা বাড়াচ্ছে। কোভিডেও শিক্ষা হল না—আসলে শতবর্ষে এ কোনো সাজানো অসুস্থতা বা অর্থনীতি চাঙ্গা করা কৌশল কিনা, কে জানে? দুষ্টু লোকের হাতে ক্ষমতা যেতে নেই। অরু ওটা জানে। আরো জানে, ধারাপাত শিক্ষার পরপরই নৈতিক শিক্ষা নিয়েছিল---“দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন”---এরজন্যই শ্রী ভগবান এ পৃথিবীতে আসেন। শ্রী ভগবানও বোধহয় হাউসগুলির দাপটে এজেন্ডা পাল্টেছেন। অহঙ্কার তার রূপ বদল করে এমনোভাবে সবার মনে জাগছে যে, তাদের উদ্দেশে একটি রবীন্দ্র সংগীত শোনার জন্য বাজানো যেতে পারে—“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।/ সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।”

মিনিট দু'য়েকের বাইকে অবস্থান অরুর মনে ঝড় তুলছে। অনিচ্ছাকৃত অপেক্ষা—জনপ্রশাসনের জন্য ভালো নয়। অরু এক-দু'মিনিট দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছে, মনটা যেন বশে থাকছে না। বিদ্রোহী হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি পৌঁছেই স্ত্রী শিউলিকে আবারো ‘দেরি কেন হল?’— এর জবাব দিতে হবে। এদিকে আকাশেও মেঘ গর্জন করছে। মেঘবালিকারা জল ঢালতে চাইছে। অন্তত প্রস্রাবের গন্ধটা উগ্র থেকে লঘু হবে, অরুর এ চিন্তায়, আনন্দ হচ্ছিল। সামনে দিয়ে গেরুয়া বসন পরিহিত একজন হৃষ্টপুষ্ট সাধু হেঁটে যাচ্ছিলেন। ঘামে তার ফতুয়াটা চপ্‌চপ্‌ করছে। বৃষ্টির আভাসে, তিনি জোরে হাঁটছেন। অরিন্দম বাগচী, তথা অরু তাঁর মধ্যে যেন কিরকম শান্তির আভাস পেলেন। তার সামনে দিয়ে সাধু চটি পায়ে হেঁটে চলে গেলেন। সম্ভবত জগন্নাথ বাড়ির সাধুই হবেন। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তাটা অন্তত ওদের থাকে না। তাই শারীরিক অবনতি সাধারণত তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

অরু ঘরে পৌঁছতে আরো পনের মিনিট সময় নিল। প্রশ্ন উঁকি দিয়েই শিউলির গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির আবাহন, অরু ভুল করে ভাবল। তারই আবাহন। যেই না ওটা শিউলি বুঝতে পারল, খিস্তিতে অরু সব ভুলে গেল। হাতের বাজারের ব্যাগটাও ভয়ে ভয়ে রাখলো। কাকতালীয়ভাবে ইমন চক্রবর্তীর কণ্ঠে ওই ‘আমায় মাথা নত.....’ গানটাই বাজছিল। ঘরে ঢুকে অরু অবাক হয়ে গেল। এমনটাও হয়!

অরু মাঝেমধ্যে ভাবে—স্ত্রীর প্রতি অনুরাগটা কম কেন? হাত-পাটা ধুয়ে নিয়ে পড়ার টেবিলটায় সদ্‌গুরুর বলা কথাগুলি

দেখছিল। লিখা আছে, "ব্যাপার কঠিন কিছু না, এক লহমাতেই হয়ে যায়। অনন্য ..... হতে পারলেই হয়। 'তুমি আমার সব'— এই কথাটা স্বীকার করে চলা চাই সেইভাবে। আর, এটা এক লহমাতেই হয়।"

অরু মনে মনে ভাবছে, সদ্‌গুরু 'একলহমা' বললেও সত্যিই কঠিন কাজ। মন পরিবর্তন না করতে পারলে, খাঁকতিওয়ালাদের দক্ষ হওয়া খুব কঠিন। ভাবলো, ওটা সকালের আফ্‌শোসের উত্তর হতে পারে। আবার ভাবে, এই যে দক্ষতা, ঘাঁটতি—শিউলি এর মর্ম বুঝবে না। বরং আরো জোরে আঘাত হানবে। বলতে বলতেই আরো একটি কথা বইটাতে দেখা গেল, "মানুষ একবেলা না খেয়েও থাকতে পারে, কিন্তু একটু হৃদ্য ব্যবহার, মিষ্টি কথা, বাহবা যদি পায়, তবে অনেকখানি কষ্ট করতে পারে।" অরু মনে মনে ভাবে, বউটার স্বভাব ভাল, হিসেব করে চলে, কাজে পটু, তবু কেন আমার কথা শোনে না। আসলে অরু হয়তো বা এর সঙ্গে চিনি মেশানোটা পারে না।

যতই ভাবে, ততই আফ্‌শোস হয়। এ কথাগুলি আরো আগে জানা থাকলে হয়তোবা এ নিদারুণ কষ্টকর সংসার জীবনটা এড়িয়ে সাধু হওয়া যেত। আবার মন বলে টাকা-পয়সারও অভাব নেই, কিন্তু এটা সত্য মন থিতু হয়েছে। এ যেন সহানুভূতিহীন মন, ক্ষুব্ধ হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। আবার অরুর কষ্টের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়াও ভালো লাগে না। এ যে "কেউ বলে ফাল্গুন, কেউ বলে পলাশের মাস, আমি বলি আমার সর্বনাশ।" কি কথা না গানটায়! অরু এখন খুঁজে 'পারিজাত।' এ যে একদিনে হয় না, সদ্‌গুরু বললেন, "আমাদের প্রবৃত্তি ও সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে থাকে, জীবন সমুদ্রে এই মন্থন চলতে চলতে যখন একনিষ্ঠ তপস্যায় সবকিছুকে আমরা সত্তাপোষণী করে তুলতে পারি, তখনই পারিজাত গজিয়ে ওঠে।"— "এই তাড়াতাড়ি চলে আস। খেয়ে যাও।" অরু শিউলির ডাকে ভাবে— "খেয়ে বাঁচি, না খেলে মুশ্‌কিল বেশি।" জীবনটাকে টেনে টেনে একটা আফ্‌শোস থেকেই গেল। 'তুমি আমার সব'— বলতে দ্বিধা হচ্ছে। তাই বিপন্মুক্ত নয়, আফ্‌শোস থেকেই গেল। কে যেন বলছে, 'সময় আছে, আগে বাঁচ, ... ।'

শিব জুয়েলার্স

প্রোঃ মণি সরকার

ভট্টপুকুর, মডার্ণ ক্লাবের নিকট, আগরতলা, ত্রিপুরা পঃ।

Mobile : 9862216846/ 7005329178

এখানে ২২ ক্যারেট ক্যাডিয়াম যুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুর করা হয়।

আজকের বিলাসিতা আগামী দিনের সঞ্চয়

মডার্ণ ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তথ্যচিত্র

ক্লাব সংলগ্ন পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর
মুখ্যমন্ত্রী প্র: (ডা:) মানিক সাহা, ক্লাব সভাপতি সজল চক্রবর্তী ও মেয়র দীপক মজুমদার

মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন ক্লাবের
প্রবীণ সদস্য মিহির চক্রবর্তী ও ক্লাব সম্পাদক সঞ্জিত নাহা (লিটন)

এলাকাবাসীর সাথে মুখ্যমন্ত্রী

ক্লাব সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

পুর নিগমের কমিশনারকে
সংবর্ধনা দিচ্ছেন ক্লাব সদস্য
দেবব্রত ভৌমিক ও জয়ন্ত ভদ্র

অনুষ্ঠানে স্থানীয় কর্পোরেটর অভিজিৎ
মৌলিককে সংবর্ধনা দিচ্ছেন ক্লাব সদস্য
বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত ও বিদ্যুৎ সেন

১৫ আগস্ট-২০২৩ ক্লাবের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে
অভিজিৎ মৌলিক ও ক্লাব সভাপতি

ক্লাবে গান্ধী জয়ন্তী উদ্‌যাপন-২০২৩

ক্লাবের নতুন সদস্য-সদস্যাদের শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন ক্লাব সভাপতি

ক্লাবের নাচের স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা

ক্লাবের আর্ট স্কুলে প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীরা

আঁকা প্রতিযোগিতায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ক্লাব সম্পাদক

ক্লাবের স্কুলে আবৃত্তি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা

ক্লাবের যোগা স্কুলে প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীরা

২০২২ সালের সেরা পূজা আয়োজনের পুরস্কার নিচ্ছেন ক্লাব সদস্যরা

স্মৃতিকথা

সেকাল এবং একাল বলতে গিয়ে সর্বপ্রথম যেটা চেতনায় আসে তা হলো আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের চেতনার বিবর্তন। সহজ সরল ভাষায় বিবর্তন বলতে ক্রমবর্ধমান একটা অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায় এ পদার্পণকে বুঝায়। পারিপার্শ্বিক সামাজিক অগ্রগতি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অগ্রগতি বিগত এক যুগেরও বেশি সময়ে খুব দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয়েছে। এতে বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা এমন একটা সময় জন্মেছি যেখানে কম আধুনিক থেকে আধুনিক হয়ে আজকের অত্যাধুনিক সমাজের সাক্ষী হতে পেরেছি। এটা নিঃসন্দেহে একটা গর্বের। আমরা ৮০ এর দশকে প্রথম সাদাকালো টিভি এবং রেডিও-এর স্বাদ পেয়েছি। আবার উন্নত রঙিন টিভি'র পর এল সি ডি, এল ই ডি হয়ে আজকের অত্যাধুনিক উন্নত স্মার্ট টিভি'র সাক্ষী হয়েছি। আর আজকের স্মার্ট টিভি'তে টিভি'র পাশাপাশি কম্পিউটার সিস্টেম থেকে ও টি টি প্ল্যাটফর্ম সব কিছুই সম্ভব।

আমাদের ছোটবেলায় টেলিফোন বইয়ের পাতায়ই দেখেছি। তখন শুধু সরকারি অফিসেই দেখা যেতো টেলিফোন। ধীরে ধীরে এর প্রসার হলো। প্রথমে বি এস এন এলের ল্যান্ডলাইন, এরপর মোবাইল ফোন থেকে আজকের স্মার্ট ফোনের আত্মপ্রকাশ।

আমাদের ছোটোবেলায় নিত্য রুটিনের মত বেশ কিছুক্ষণের জন্য লোডশেডিং হতো। কেরোসিনের হ্যারিকেন, টেবিল ল্যাম্প, কুপি, গোবরের ঘুঁটে দিয়ে আলো জ্বালানো, চার্জ লাইট, সোলার লাইট (যদিও অনেকটা পরে) এই ছিল ভরসা। গরমকালে লোডশেডিং-এ খোলা ছাদে লণ্ঠনের আলোয় পড়ার মজা সেই বুঝবে যে তা অনুভব করেছে। অন্ধকারে জোনাকির আলোয় আনন্দ খোঁজা যে কি রকম আনন্দ ছিলো, আজকের ঝাঁ চকচক আলোয় পড়া নতুন প্রজন্মের কাছে তা রূপকথার গল্পের মত শোনাবে।

আমাদের ঐ বেলায় পাড়ায় হাতে গোনা কয়েকজনের বাড়িতে টেলিভিশন বা রেডিও ছিলো। ভারতের ক্রিকেট খেলা হলে ধারাভাষ্য শুনতে বা দেখতে সবাই জড়ো হতেন তাদের বাড়িতে। ভারতের খেলায় সবাই মগ্ন থাকতো বলে ঐ সময় নিঝুম থাকতো গোটা পাড়া। ভারতের মারা ৬ /৪-এ আনন্দের চিৎকার শোনা যেত। বিপক্ষের উইকেট পড়লে শোনা যেতো থালা- বাসন বাজানোর শব্দ।

আমাদের ঐ সময়কার মহালয়া বলতে কাকভোরে উঠে রেডিওতে শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় কালজয়ী সেই মহালয়া পাঠ শোনা, আর দূরদর্শনের পর্দায় মহিষাসুর মর্দিনি নৃত্যনাট্য দেখা। তারপর মহালয়ার সকালে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া। আজ কত কত চ্যানেল, সামাজিক মাধ্যমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া পাঠ শোনা যায়। মহিষাসুর মর্দিনি নৃত্যনাট্যও প্রায় সব চ্যানেলে উপলব্ধ। আমাদের ছোটাবেলায় মহালয়া মানেই ছিলো শুধু আকাশবাণী ও দূরদর্শন। বলাই হয় বাঙালির দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটে মহালয়ার শুভ বন্দনাতে এবং মাতৃ পক্ষের সূচনার মধ্য দিয়ে।

আমাদের কৈশোর থেকে যৌবনের সময় আমরা আমাদের ক্লাবকে যেভাবে দেখেছি, সাজিয়েছি তা এখনও মনে আছে। আমাদের সবার প্রিয় মডার্ণ ক্লাবের ভিত্তিপ্রস্তর হয় নাগেরজলার খালের উপর বাঁশের মাচা করে। চারিদিকে বাঁশের বেড়া। উপরে টিনের চাল। এই ভাবেই মডার্ণ ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। পাড়ার সবাইকে নিয়ে আমরা বড় ও ছোটরা মিলে সম্মিলিত উদ্যোগে ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে গেছি। প্রথম থেকেই সামাজিক, সংস্কৃতিক, ক্রীড়া থেকে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এসেছে মডার্ণ ক্লাব।

সে সময় ক্লাবের বারোয়ারি পুজোয় পাড়ার সকলে হৃদয় দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বিভিন্ন কাজকর্মের সাথে ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ সবেতেই আনন্দ হতো। আজ সবার সহযোগিতা ও ভালোবাসা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মডার্ণ ক্লাবের বড় দালানবাড়ি হচ্ছে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষাদানসহ ক্লাবকে ঘিরে আমাদের যা যা স্বপ্ন ছিল সেগুলো আগামীদিনে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করি। আশা রাখছি আজকের আমাদের থিম পুজোয় একইভাবে পাড়ার প্রত্যেকে দারুণভাবে অংশ নেবেন। ক্লাবের গৌরবের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন। সকলের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে আমাদের প্রিয় মডার্ণ ক্লাব। যুবরা যারা ক্লাবের সাথে যুক্ত তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো তারা যেন তাদের মূল্যবান সময় বের করে ক্লাবকে কিছুটা সময় দেন।

দুর্গাপূজার দশমীর ভাসানে এলাকার নারী-পুরুষ সবাই অংশ নেন। সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে আমরা সকলের সাথে মিলে যাতে এগিয়ে যেতে পারি এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এটা সত্যি খুব ভালো বিষয় যে, বিগত প্রায় ১ যুগেরও বেশি

সময়ে সমাজ এবং আমাদের জীবনযাত্রার মান এতটাই বদলেছে যে আমরা আজ ঝাঁ চকচকে সমাজে এসে গেছি। এখন সিনেমা হল প্রায় নেই বললেই চলে। সিনেমা এসে গেছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাল্টিপ্লেক্সে। শহরের হকার্স মার্কেটের গলি পরিবর্তিত হয়ে গেছে শপিং মলে। খেলার মাঠ পরিবর্তিত হয়ে গেছে গেমজোনে। পাড়ার খোলা পুকুরগুলো হয়ে যাচ্ছে সুইমিং পুল। আড্ডা মানে মনের খুশির একটা ব্যাপার। এটা পাড়ার আড্ডা হোক বা ক্লাবের, মাঠের আড্ডা হোক বা চা স্টলের —আজ সব আড্ডার জায়গা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে। শহরের পাড়াগুলোতে আজ হচ্ছে গগন চুম্বি ফ্ল্যাট। প্রভাতী সংবাদপত্র আজকাল স্মার্ট ফোনে চলে এসেছে। বিজ্ঞানের ও টেকনোলজির প্রয়াস এবং প্রসারে আমরা অনেক অনেক উন্নত হয়েছি। আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তার সাক্ষী হতে পেরে খুব খুব আনন্দ অনুভব করি। কামনা করি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি আমাদের সরলতা, সজীবতা, হৃদয়ের আত্তিক টান, প্রতিবেশীর সাথে ভাব-ভালোবাসা, ভালো কিছু করার মানসিকতা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি আন্তরিকতা যেন আগের মতোই বজায় থাকে। যুবসমাজ যাতে সঠিক পথে চলে এবং সুস্থ সুন্দর নেশামুক্ত এক সমাজ গড়ে তোলা যায় অভিভাবকদের এদিকে নজর রাখতে হবে। এমন সুস্থ সুন্দর ভালো পরিবেশে কেটেছে আমাদের ছোটোবেলা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একই শিক্ষা দিলে তবেই অতি উন্নত সমাজের মধ্যে উন্নত চেতনার মানুষ গড়ে উঠবে। লিখতে লিখতে যেন সেই অতীতে চলে গেছি। আন্তরিকভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করি আনন্দের ধারাটা যেন বজায় থাকে। পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে আগামীদিন ও শারদ উৎসবের প্রতিটি দিন যাতে খুশি ও আনন্দে ভরে থাকে এই প্রার্থনা করি। উৎসবের প্রতিটি দিন হয়ে উঠুক শান্তির ও আনন্দের। সবার প্রতি রইলো শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

Arindam Sir's
Steno Classes

MAX COMPUTER & STENOGRAPHY TRAINING INSTITUTE

(A Registered Commercial & Technical Education Institution)

Admission Open

Our Special Course
- Shorthand Writing (Steno)
- Computer Typing Course
- Computer Education course
- Competitive Exam class

And Special Preparation for TPSC, SSC, COURT, Competitive Exam

Principal Mr. A Chakraborty
Mobile : 9862463434

গল্প

মরা ইঁদুর ও উদ্যোগপতি

অরুণোদয় সাহা

একটি নিঃস্ব রিক্ত যুবক মগধের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সকাল থেকে। মগধ হল রাজধানী এবং সে সময়ের বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র। দেশের বড়ো বড়ো শ্রেষ্ঠীরা মগধে বাণিজ্য সূত্রে বসবাস করেন। যুবকটি দেহাত থেকে মগধে এসেছে জীবিকান্বেষণে। তার মূলধন হিসাবে কিছুই নেই — নিজস্ব বলতে আছে শুধু শ্রম এবং বুদ্ধি। শ্রম এবং বুদ্ধি সম্বল করে যুবকটি মগধে এসেছে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। কিন্তু মগধ একটি কঠিন জায়গা, এখানে যে কোনও একটা উদ্যোগ নিলেই কম হোক বেশি হোক মূলধন বা পুঁজির দরকার। কপর্দকশূন্য যুবকটি তাই সকাল থেকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে আর ভাবছে—কী করা যায়।

এমন সময় মগধের একজন শ্রেষ্ঠী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে পেছনে অর্থী-প্রার্থীদের ভিড়। শ্রেষ্ঠী হাসলে এরাও হাসে। শ্রেষ্ঠী অসন্তুষ্ট হলে এরাও অসন্তুষ্ট হওয়ার ভান করে। কাছাকাছি এলে যুবকটি দেখল, অর্থী এবং প্রার্থীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠীকে চলতে চলতে বলল, আপনি একটা পথ বাতলে দেবেন বলেছিলেন, যাতে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে-পরে বাঁচতে পারি। দয়া করে বলে দিন, আমি কী করি, কী দিয়ে শুরু করি।

শ্রেষ্ঠী সহাস্যে বললেন, কিছু একটা শুরু করতে চাও তো, শুরু করে দাও। আটকাচ্ছে কোথায়? লোকটি বলল, কী দিয়ে প্রথম শুরু করব, সেটাই কিন্তু বুঝতে পারছি না।

ভ্রু কুঞ্চিত করে শ্রেষ্ঠী বললেন, শুরু করার আবার কী বা কিন্তু আছে নাকি? যে কোনও একটা কিছু দিয়েই শুরু করা যায়। তুমি শুরু তো করো, তারপর আমাকে বোলো। লোকটি হতাশ হয়ে বলল, আমি হেঁয়ালি অতশত বুঝি না। দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন, প্রথমে আমি কী দিয়ে শুরু করব। শ্রেষ্ঠী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। তাকিয়ে দেখলেন, রাস্তার পাশে একটা বড়োসড়ো ইঁদুর মরে পড়ে আছে। শ্রেষ্ঠী পাশ ফিরে লোকটার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, ওই দেখো, একটা মরা ইঁদুর, এটা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। চেষ্টা তো করো একটা।

লোকটা মলিন হেসে বলল, আমি গরিব বলে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। আপনি ধনী, বড়লোক। আপনি অঢেল অর্থোপার্জন করেছেন, অথচ আমাকে কীভাবে সহজে টাকা পয়সা উপার্জন করতে হয় তা খুলে বলছেন না। একটা মরা ইঁদুর দেখিয়ে আমাকে আপনি এড়াতে চান। আপনি মশকরা করছেন আমার সঙ্গে। শ্রেষ্ঠী বললেন, আরে না, না। মশকরা কেন করব? আমি যা বলতে চেয়েছি, তা হল ক্ষুদ্র তুচ্ছ বলে কোনও ব্যাপার নেই। ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য একটা মরা ইঁদুরও তুচ্ছ নয়। তুমি যদি চেষ্টা না করতে চাও, ভিন্ন কথা। তুমি অলস। কিন্তু কেউ চাইলে, এই মরা ইঁদুরটি দিয়েই ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারে।

কথা বলতে বলতে শ্রেষ্ঠী সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দূরে গিয়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। নিঃস্ব যুবকটি ভাবল, মগধের এত বড়ো একজন শ্রেষ্ঠী, তিনি যখন বলেছেন এই মরা ইঁদুরটিকে দিয়ে শুরু করা যায় তখন নিশ্চয়ই কিছু করা যায়। শ্রেষ্ঠী তো আর এলেবেলে লোক নন। তিনি যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে সত্যতা আছে। এগিয়ে এসে যুবকটি তখন মরা ইঁদুরের লেজটি আঙুল দিয়ে তুলে ধরল। মৃত ইঁদুরটি ঝুলে রইল মাথা নিচু করে। যুবকটি ভাবতে লাগল, এখন কী করি! শুরু তো করলাম কিন্তু তারপর? যুবকটি মৃত ইঁদুরটিকে নিরালম্ব ঝুলিয়ে রেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

পথ চলতি লোকজন কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে দেখছে তারপর আবার চলে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল অন্য একজন ধনবান ব্যক্তি। তার কোলে ছিল একটি আদরের বেড়াল। হঠাৎ বিড়ালটি ঝাঁপ দিয়ে যুবকটির হাত থেকে ইঁদুরটিকে ছিনিয়ে নিল। ধনবান লোকটি ঘটনার আকস্মিকতায় খুবই বিড়ম্বিত হল। থলে থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যুবকটির হাতে গুঁজে দিয়ে বিড়ালটিকে কোলে করে নিয়ে চলে গেল। ইতোমধ্যে বিড়ালটি ইঁদুরটিকে গলাধঃকরণ করে ঢেঁকুর তুলছে। যুবকটির বিস্ময়ের সীমা নেই। মরা ইঁদুরের পরিবর্তে তার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা। শুরুটা তাহলে ভালোই হয়েছে। তারপর যুবকটি সেই স্বর্ণমুদ্রাটিকে বিনিয়োগ এবং বারবার বিনিয়োগ করে কিছুকালের মধ্যেই মগধের শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম ধনবান শ্রেষ্ঠী বনে গেল। যুবকটি প্রৌঢ় হল। মগধের শ্রেষ্ঠীকুলের মধ্যে সে একদিন নাম্বার ওয়ান হল। খুঁজে খুঁজে সেই পুরোনো শ্রেষ্ঠীকে বের করে তার পায়ের কাছে স্বর্ণমুদ্রার থলে রেখে প্রণাম করল সে। শ্রেষ্ঠী তাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললেন, এগুলো কী?

সে বলল, আপনি বলেছিলেন, যা কিছু দিয়েই শুরু করা যায়। এমনকি মরা ইঁদুর দিয়েও— আপনার হয়তো মনে নেই। আমি আপনার উপদেশ-নির্দেশমতো চলেছি। এটা দক্ষিণা, আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।

মনিষী

কালজয়ী শচীন দেববর্মণ

অনিন্দিতা দে

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি গানের কিংবদন্তিতুল্য ও জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক, সুরকার, গায়ক ও লোকসংগীত শিল্পী ছিলেন শচীন দেববর্মণ। যাঁকে আমরা এস ডি বর্মণ হিসেবেও জানি। তাঁর জন্ম কুমিল্লার ত্রিপুরা রাজবাড়িতে। তবে আদিবাস বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। প্রায় ১০০ বছর পার করেও বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে তাঁর কালোত্তীর্ণ গানের অবদান একটুকুও লঘু হয়নি।

তিনি ছিলেন ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় মাণিক্য রাজ পরিবারের সন্তান। বাবা নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মণের কাছে সংগীত শিক্ষা শুরু করেন, মা ছিলেন মণিপুর রাজবংশের মেয়ে নিরুপমা দেবী। পড়াশোনার দিক দিয়েও তিনি ছিলেন পারদর্শী। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। সেই কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। তারপর বিএ-তে ভর্তি হন। তারপর তিনি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে ভর্তি হন।

১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে সংগীতের প্রথাগত তালিম নেওয়া শুরু করেন। তারপর একে একে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সারেঙ্গীবাদক বাদল খান, সরোদবাদক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের কাছে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কুমিল্লায় থাকাকালীন বিখ্যাত কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক দক্ষতাও গড়ে উঠেছিল। তারপর তিনি স্থায়ীভাবে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইতে বসবাস করা শুরু করেন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে তিনি প্রথম গান করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বের হয় হিন্দুস্তান মিউজিয়াম প্রোডাক্টস থেকে। তাঁর প্রথম রেকর্ড করা দুটি গান হল পল্লীগীতি ঢঙে গাওয়া 'ডাকিলে কোকিল রোজ বিহানে' যার গীতিকার হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং খাম্বাজ ঠুমরি অঙ্গের রাগপ্রধান 'এ পথে আজ এসো প্রিয়' যার গীতিকার শৈলেন রায়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজগী নামক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর সংগীত পরিচালনা জীবন শুরু হয়। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য গান হল :

(১) যদি দক্ষিণা পবন (রাগ প্রধান)
(২) প্রেমের সমাধি তীরে (কাব্য গীতি)
(৩) নিশীথে যাইও ফুলবনে (পল্লীগীতি)
(৪) ওরে সুজন নাইয়া (পল্লীগীতি)
(৫) শোনোগো দখিন হাওয়া
(৬) কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া। আরো অনেক বহু গান।

তিনি পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলা পল্লীগীতির মাধ্যমে রেডিওতে গান গেয়ে জনপ্রিয়তা এবং অনেক সম্মান, পুরস্কারও অর্জন করেছিলেন। তিনি এশিয়া ফিল্ম সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড পান ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেপথ্যে কণ্ঠশিল্পী অ্যাওয়ার্ড পান ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী খেতাব পান ১৯৬৯ সালে। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র রাহুল দেববর্মণও ছিলেন ভারতের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক ও সুরকার এবং তার ছাত্রী পরবর্তীতে তাঁর সহধর্মিণী মীরা দেববর্মণ গীতিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

সর্বশেষে বলা যায় শচীন দেববর্মণ ওরফে শচীনকর্তা আমাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের তথা ত্রিপুরার গর্ব। পল্লীগীতি জগতের একজন কিংবদন্তি জনপ্রিয় শিল্পী যাঁর সংগীত জগতের তুলনা অপরিসীম।

কবিতা

পেঁজাতুলোর আকাশে চিরায়ত সঞ্চার

সংহিতা ভট্টাচার্য

ছিপছিপে আষাঢ়ি ফোঁটায় রথের দড়িতে টান পড়ার কদিন বাদেই উঁকি দেয় শিউলি পদ্মের শরৎ।
খুঁটি পূজোর মহড়া ডাক দেয় দশপ্রহরণধারিণীর আনন্দোচ্ছ্বাস।

গতানুগতিক কর্মব্যস্ততার চৌকাঠে আগমনী সুর মানেই খুশির প্লাবন।
নতুন ক্যালেন্ডার হাতে এলেই শারদীয়ার চারটে দিন গাঁথা হয়ে থাকে।
অঞ্জলি দেওয়া, পেট পূজো আত্মীয় সমাগমে হাঁফ ছেড়ে ইচ্ছেমতো বাঁচা। নতুন কি
কি কেনা দরকার, কোথায় বেড়াতে যাওয়া, আলোচনাতে
কাশের দোলায় গুটি গুটি হাজির হয় কাকভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ
ভদ্রের মন্ত্রমুগ্ধ স্তোত্র পাঠের আসর।

ঐতিহ্যবাহী পালকি'তে কলাবউ স্নানে ঘন্টা কাঁসর
নবপত্রিকা আনলেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা, ভোগ আরতি
গুঞ্জরণে আঁতশবাজির রোশনাই।
সপ্তমী অষ্টমী চুকে বিষাদ ঘেরা নবমী নিশি, শুভ
বিজয়ার ফিকে দ্যোতনার মন কেমন!

একলা কাব্যে বেলা অবেলা কেটে যায় উদাসী সুরে।
আগন্তুক সময় এগিয়ে চলে, স্মৃতিরা চুপিসারে পিছু হাঁটে!

জয়রাম সিট মেকার

এখানে বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর সিট কভার বানানো হয় এবং রিপেয়ারিং করা হয়

Prop : Pradip Nag

Mob : 9612225598/9366773161

নাগেরজলা বাস স্ট্যান্ড। মডার্ণ ক্লাবের পেছনে। আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা

বৃদ্ধা যখন শিশু

পার্থ চক্রবর্তী

চোখের জল থামছে না বুড়ি মা'র। কেঁদেই চলছেন। পঁচাশি বছর বয়সেও দেখতে সুন্দরী। কিন্তু কেন কাঁদছেন বুড়ি মা? সে গল্পই করবো। তার আগে একটু নিজের কথা বলে নিই।

কোথাও কখনও কোনও প্রবন্ধ, ছড়া, গল্প, কবিতা কিছুই লিখিনি। এখন মধ্য বয়স পার করে এসে ইচ্ছে হল কিছু একটা লেখার। তো ভাবছি কি লিখবো? হঠাৎ মনে পড়লো বুড়ি মা'র কথা। একটি বৃদ্ধাশ্রমে দেখা বুড়ি মা'র সাথে। লায়ন্স ক্লাবের কাজের সূত্রে গিয়েছিলাম ঐ বৃদ্ধাশ্রমে।

আমি লায়ন্স ক্লাবের সঙ্গে আজ প্রায় ১২ বছর ধরে যুক্ত। সবাই জানেন এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় আমেরিকায়। বছরভর সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত লায়ন্স ক্লাব। লায়ন্স ক্লাব অব আগরতলা (রাজধানী)'র সম্পাদক আমি। প্রতি মাসে আমাদের অন্ততপক্ষে একটি সামাজিক কাজ করতে হয়। যার পোশাকি নাম— One District, One Activity। এরকমই একটি সামাজিক কাজে লায়ন্স ক্লাবের হয়ে বড়জলায় 'আপনঘর' বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম। 'আপনঘর' এর প্রধান ছিলেন স্বর্গীয় মিলনপ্রভা মজুমদার। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় সুধীর রঞ্জন মজুমদারের স্ত্রী।

বয়স্কা মহিলাদের জন্য বিভিন্ন মুদি সামগ্রী নিয়ে যাই। মিলনপ্রভা দেবী আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন। এখানকার আবাসিক বয়স্কা বিধবাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। সেই সময় মিলনপ্রভা দেবী আমাদের অনুরোধ করেন তাদের জন্য একটা স্বাস্থ্য শিবির যেন করি। আমরা উনার অনুরোধ রক্ষা করতে 'আপনঘর'-এ স্বাস্থ্য শিবির করি পরের মাসেই। সেদিন সমস্ত আবাসিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন আমাদের লায়ন্স ক্লাবের দশজনের মতো চিকিৎসক। তারা সবাই 'লায়ন্স ক্লাব অব আগরতলা (রাজধানী)'র সদস্য। সমস্ত বয়স্কা মায়ের চোখ পরীক্ষা, ব্লাড প্রেসার, র‍্যানডম ব্লাড সুগার ও পালস্ চেকআপ করা হয়। যার যেই ওষুধ প্রয়োজন বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে।

বৃদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিলেন জ্যোৎস্নারাণী ভট্টাচার্য। ৮৫ বছর বয়সি এই বুড়ি মার কথাই বলছিলাম। তাকে দেখে মনেই হয়নি তার এতোটা বয়স। এই বয়সেও দেখতে খুবই সুন্দরী। সবার সঙ্গে এই বুড়ি মায়েরও সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। আশ্চর্য এই বয়সেও তার সবকিছু একদম স্বাভাবিক। যেহেতু সবকিছু স্বাভাবিক, তাই বুড়ি মা'কে ওষুধ দেয়ার প্রশ্নই নেই। কিন্তু মা তো বসে আছেন ওষুধের জন্য। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— 'বাবা আমাকে ওষুধ দেবে না?' আমি বললাম— 'মা তোমার তো সবকিছুই স্বাভাবিক। তোমার কোনও ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই।' বলামাত্রই বুড়ি মা কাঁদতে শুরু করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'মা তুমি কাঁদছো কেন?' উত্তরে বললেন— 'সবাইকে ওষুধ দিচ্ছো, আমাকে কেন দিচ্ছো না?' আমরা সবাই বললাম— 'তোমার কোনও রোগ নেই, কি ওষুধ দেবো?'

দেখি বুড়ি মা'র চোখ থেকে আবার জল গড়িয়ে পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম— 'আচ্ছা তোমার কি অসুবিধা বলো।' উত্তরে বললেন— 'আমি তো বাবা বলদ (বল /Strength) পাই না।' বললাম— 'তুমি তো কীর্তন করলে, নাচলে কোথায় তুমি দুর্বল?' এতে আরও রাগ করলেন বুড়ি মা। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন— 'আমাকে ওষুধ দেবে না তো ঠিক আছে, এতো কথা বলতে পারবো না।' বাধ্য হয়ে তাকে 'ও আর এস' এর দু'টি প্যাকেট দিলাম। তাতেই বুড়ি মা খুব খুশি। আমাদের আশীর্বাদও করলেন। অল্পেতেই তুষ্ট হলেন তিনি। শিশুর মত আবদার করে 'ওষুধ' নিলেন। অনেকেই শেষ বয়সে এসে শিশুর মতো আচরণ করেন। এই বুড়ি মা তাদেরই একজন। সত্যিই মানুষের জীবন কি বিচিত্র!

Modicare

Distributor Point

চিন্তা ভাবনা পাল্টান দোকান পাল্টান

Personal Care, Home Care, Skin Care, Wellness
৬ মাস বাজার করলে ১ মাস বিনামূল্যে বাজার ফ্রী এবং
১বছর বাজার করলে ৩টা বাজার ফ্রী।
এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে আকর্ষনীয় অফার

Nagerjala, Near Modern Club, Agartala
M: 8837266238/ 9862482112

আদ্যা শক্তি মেডিকেল হল

Chemist & Druggist

এখানে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে

Prop : Abhijit Bhowmik
Nagerjala, Near Modern Club, Agartala
M: 9862482112 / 8837266238

আলোচনা

প্রতিবিম্বে 'প্রতিবিম্ব'

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

'প্রতিবিম্ব' শহর আগরতলার সাংস্কৃতিক জগতের এক উল্লেখযোগ্য নাম। সেই ৮০ এর দশকের গোড়া থেকে 'প্রতিবিম্ব'র আত্মপ্রকাশ মূলত মডার্ন ক্লাবের নাট্য শাখা এবং সাংস্কৃতিক মনন-চিন্তন পটভূমির এক যুগান্তকারী আলোড়ন, যা ছিল ক্লাব সদস্যদের সম্মিলিত একটা ঐকান্তিক প্রয়াস। শুরুর দিকে ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বের হতো। পরে পূজা সংখ্যা বা শারদ সংখ্যা হিসাবে বের হয়ে আসছে। তাতে মূলত আলোকপাত করা হতো ক্লাবের নানা সামাজিক কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ, মডার্ণ ক্লাবের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং ক্লাবের নাট্য সংস্কৃতি। ঠিক যেন কাজের সাথেই মিল রেখেই নামকরণ। হ্যাঁ 'প্রতিবিম্ব' ঠিক যেন প্রতিবিম্ব হয়েই মডার্ণ ক্লাবের সমস্ত গঠনমূলক কাজগুলোকে সমাজে আলোকপাত করে চলেছে। "প্রতিবিম্ব নাট্য সংস্থা" সেই একই সময়ে উন্মোচিত এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবিম্ব নাট্যসংস্থা তাদের নাট্য মেধায় অর্জন করেছে বহু সম্মান এবং বহু পুরস্কার। আগরতলার রবীন্দ্র ভবন, খোয়াই টাউন হলসহ বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় এই নাট্যদল নিজেদের বারবার প্রমাণ করেছে এবং মডার্ণ ক্লাবের গৌরব ও সম্মানের পতাকা উঁচু করেছে। উত্তর - পূর্বাঞ্চলীয় শেখর স্মৃতি নাটক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় শ্রেষ্ঠ ও তৃতীয় প্রযোজনার পুরস্কারসহ বহুবার পুরস্কৃত হয়েছে। আগরতলায় অনুষ্ঠিত মানস গাঙ্গুলী স্মৃতি নাটক প্রতিযোগিতায় ৪র্থ স্থান দখল করেছে।

নানা কারণে প্রতিবিম্ব নাট্য মঞ্চ বন্ধ হয়ে গেছে। শারদ সংখ্যা 'প্রতিবিম্ব' সেই আশির দশক থেকে এখনো তার গৌরবের ধারাকে অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এনেছে বহু পুরস্কার আর তার সাথে অর্জন করেছে বহু সম্মান। যেটুকু মনে পড়ে তার মধ্যে ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড কর্তৃক ২০০৩ সালে 'প্রতিবিম্ব' প্রথম স্থান অর্জন করে। ২০০৪ সালে 'প্রতিবিম্ব' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ২০১৪ সালে 'প্রতিবিম্ব' তৃতীয় যুগ্ম স্থান দখল করে। ২০২২ শারদ স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব' দ্বিতীয় স্থান দখল করে।

'প্রতিবিম্ব' যুবসমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে এক সঠিক দিশা দেখাচ্ছে। ভবিষ্যতেও দেখাবে। এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের চিন্তা ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটবে যা আগামীদিনের উন্নতির সোপান গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ক্লাব সদস্য ও এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতাই এই শারদ সংখ্যার সার্থকতা।

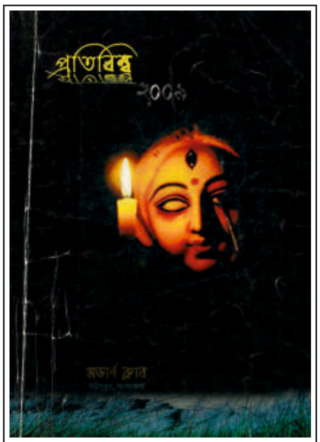

প্রতিবিম্ব-২০০৯

প্রতিবিম্ব-২০১৪

প্রতিবিম্ব-২০২২

মনিষী

বিশ্বজনীন বিবেকানন্দ

বসুধৈব কুটুম্বকম ভাবধারায় শিকাগো অভিযান

সুব্রত সাহা

প্রতি বছর ১২ জানুয়রি যুব দিবসের দিনটি আমাদের সজাগ করে দিয়ে যায় এই বলে "জাগো ওঠো...... জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় তোমাদের কি এখনও ঘুমিয়ে থাকা সাজে?" সত্যিই স্বামীজির এই আহ্বানে সাড়া দেয় কয়জন? চারিদিকে উৎপীড়ন, নিপীড়ণ, অসহ্য যন্ত্রণা, অত্যাচার, দুর্নীতি অন্যায় অবিচার, উফ্! যা এক প্রকার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের এই উদাত্ত আহ্বান আমাদের আরও একবার ভাবিয়ে তুলছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা আজ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। পাছে রক্তচক্ষুর ভয়ে আমরা বেহিসেবি কর্মকাণ্ডকেও প্রশ্রয় দিয়ে চলছি নির্বিকার চিত্তে, সত্যকে মিথ্যা জানিয়ে। অথচ বেআইনিকে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সটান বুক চিতিয়ে জীবিত মানুষকে মৃত আখ্যা দিয়ে চলছি। এই মুহূর্তে যদি তিনি (স্বামীজি) বেঁচে থাকতেন তাহলে জীবন্ত কবর খুঁজতেন।

স্বামীজি পৃথিবীটা ঘুরে এসে বললেন, "ডেমোক্রেসির (গণতন্ত্রের) মাথা মুণ্ডু নেই— দু'চারজন লোকই দেশ চালাচ্ছে। দেশ যখন কাজ চালাবার উপযুক্ত লোক দিতে পারে না, তখনই দেশ গোল্লায় যায় (তথ্যসূত্রঃ স্মৃতির আলোকে স্বামীজি পৃঃ সংখ্যা ৫)।" আমাদের তো ধর্মপ্রাণ দেশ। আমাদের দেশ বরাবর Saint Produce (সাধু পুরুষ) প্রসব করে আসছে। ইতিহাসে এমন একটা সময় দেখা যায়নি, যখন আমাদের দেশে এটি হয়নি। এক একটা জীবন কত শত বছর কত লোককে চালাচ্ছে। দেখ না নানক, কবীর, দেখ তুলসীদাস, কতদিন থেকে এ দেশটা তারা চালাচ্ছেন, (তথ্যসূত্রঃ স্মৃতির আলোকে স্বামীজি)।

স্বামীজি বলতেন ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভারতের সেই ভাব এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতে চিরকাল ধরে ধর্মবীর সাধক পুরুষ জন্মে আসছেন। ভারতকে সমগ্র জগতে এই কর্ম বিস্তার করতে হবে। স্বামীজির কথা ফলবেই, দেশ আবার জেগে উঠবে।

স্বামীজি একবার বলেছিলেন, "এবার আর কিছু বলতে বাকি রেখে গেলাম না।" তিনি সব বলে গেছেন। এখন তাঁর সেই ভাবই নানাবিধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে কার্যে পরিণত হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধি তারই একটি প্রণালী মাত্র। স্বামীজির সেবাধর্মের প্রবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁর বিশ্বাস ভারতের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেছেন যে তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে না পারেন পরে নিশ্চিত হবেই হবে। স্বামীজির সুরেই তাল মিলিয়ে ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ

বাণী করে গেছেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব—

"ভারত আবার জাগিবে উঠিবে নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন দৃশ্য দেখে চিত্ত নয় মোর ভীত"।

সনাতনী হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে স্বামীজি কত না কষ্ট করেছিলেন শিকাগো যাত্রাকালে সেই কাহিনি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে চান বিশ্বের সামনে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করাসহ ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করতেই স্বামীজির শিকাগো যাত্রা। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে গুরুদেব শ্রী রামকৃষ্ণের আদেশ অনুভব করলেন এবং জগজ্জননী সারদা মায়ের আশীর্বাদও পেলেন। স্বামীজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। স্বামীজি ৩১ মে ১৮৯৩ সালে জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রায় আমেরিকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। ভারতের কল্যাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং বেদান্ত ধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁর আমেরিকা যাওয়ার উদ্দেশ্য। বিশেষত ভারতের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণী পাশ্চাত্যে প্রচার এবং ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণে সর্বতোভাবে চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে শিকাগো ধর্মসভায় সনাতন হিন্দু ধর্মের জাত চেনালেন স্বামীজি।

তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল, রাজস্থানের খেতরি মহারাজ আরও অনেকে যারা তাঁর অনুরাগী ছিলেন স্বামীজির যাত্রার খরচ বহন করেছিলেন। জাহাজে কলম্বো, সিঙ্গাপুর, জাপানের নাগাসাকি বন্দর হয়ে ইয়োকোহামা গেলেন এবং সেখান থেকে আমেরিকার উদ্দেশে জাহাজে চড়ে ২৫ জুলাই ১৮৯৩ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ স্বামীজি আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন। সেখান থেকে কয়েকটি ট্রেন পরিবর্তন করে ৩০ জুলাই রাত্রিবেলা শিকাগো এসে পৌঁছান। কিন্তু শিকাগো এসে স্বামীজি বুঝলেন যে পরিচয়পত্র ছাড়া ধর্ম সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করা কঠিন এবং তাঁর কাছে কোনো পরিচয়পত্র নেই।

এই পরিস্থিতিতে ধর্মসভায় ভাষণ দেওয়ার আশাও ক্ষীণ হতে লাগল। অন্যদিকে শিকাগোতে জীবনযাত্রার খরচও অনেক বেশি ছিল। স্বামীজি কিছুটা হতাশ হয়ে কম খরচে থাকার জন্য আমেরিকার বস্টনে চলে গেলেন। স্বামীজি বিদেশে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। লক্ষ্য একটাই ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে দাঁড় করানো সনাতনী হিন্দু ধর্মের বেদান্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে, ঈশ্বরই স্বামীজিকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছেন ভারতের উন্নতির জন্য এবং পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতকে প্রতিস্থাপন করতে। ঈশ্বরের কৃপায় মিসেস ক্যাথারিন স্যানবোর্নের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে শিকাগো যাওয়ার সময় ট্রেনে স্বামীজির সাথে পরিচয় হয়ে যায়। উনার কারণে স্বামীজি বস্টনে তাঁর বাড়িতে উঠেন। বস্তুত আমেরিকায় প্রথম মিসেস ক্যাথারিন অপরিচিত ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং কালক্রমে অধ্যাপক রাইট ও অন্যান্য আমেরিকার শিক্ষিত প্রভাবশালী পুরুষ ও মহিলাদের সাথে পরিচয় করে দিয়েছেন। নয়ত শিকাগো ধর্মসভায় এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর আর বক্তৃতা দেয়া হতো না।

স্বামীজি তাঁর ধর্মমত ও দর্শন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। ফলে ক্রমশ স্বামীজি সম্পর্কে এক উচ্চধারণা গড়ে উঠেছিল আমেরিকাবাসীদের মধ্যে। দৈবক্রমে তিনি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে পরিচিত হলেন। স্বামীজির সঙ্গে মিলিত হয়ে মিঃ রাইট বুঝেছিলেন যে এই হিন্দু সন্ন্যাসী একজন সন্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি যখন স্বামীজির আমেরিকা আসার কারণ এবং নানা অসুবিধার কথা শুনলেন, বিশেষ করে অর্থের অভাব ও পরিচয়পত্রের শূন্যতা তখন অধ্যাপকজী মিঃ রাইট বললেন — "স্বামীজি আপনার কাছে পরিচয়পত্র দেখিতে চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ বিকিরণের কী অধিকার আছে তা জিজ্ঞাসা করা একই কথা।" মিঃ রাইট স্বামীজির প্রতিভা উপলব্ধি করলেন এবং অনুভব করলেন যে ধর্ম সম্মেলনে জগৎকে স্বামীজির বাণী শোনাতে হবে। মূলত অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহায়তায় ও আন্তরিকতায় হৃদ্ধ হয়ে স্বামীজি শিকাগো ধর্মসভায় নিজ ভাষণ ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। এদিকে ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ডঃ রাইটের কাছ থেকে শিকাগো যাওয়ার অনুমতিপত্র পেয়ে যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন স্বামীজি। কিন্তু ধর্ম মহাসম্মেলনের জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেন্ড জন হেনরি বারোজের ঠিকানা হারিয়ে যাওয়ায় স্বামীজি কিছুটা অসহায় বোধ করলেন এবং বিধ্বস্ত হয়ে জগন্মাতার উপর ভরসা রেখে পথপ্রান্তে বসে রইলেন, অবশেষে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদে রাস্তার বিপরীত দিকে বাড়ি থেকে মিসেস হেল এগিয়ে এলেন এবং স্বামীজিকে বাড়িতে নিয়ে আশ্রয় দিলেন। তিনি স্বামীজিকে মহাসম্মেলনের কার্যালয়ে নিয়ে যান এবং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সব অফিশিয়াল কাজকর্ম শেষ করান। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, প্রফেসর রাইটের চিঠি ও মিসেস হেলের তৎপরতায় স্বামীজি গৃহীত হয়েছিলেন ধর্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে। এই ধর্ম সম্মেলনে খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়াও আরও আটটি ধর্মের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটে ঐতিহাসিক ধর্ম মহাসম্মেলন শুরু হলো। ধর্ম মহাসভা চলেছিল সতেরো দিনব্যাপী— সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায়। প্রথম দিন সভার প্রেসিডেন্টের আহ্বানে স্বামীজি অবশেষে বিকাল বেলায় অধিবেশনে বক্তৃতার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বিবেকানন্দের সবচেয়ে স্মরণীয় বক্তৃতা, যার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে ভারতের হিন্দু ধর্মকে নতুন সম্মানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামীজি সরলভাবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' ভাবধারায় ভারতীয় সম্বোধনে বলিলেন, 'হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'। এই

সম্বোধনেই সাত হাজার দর্শক -শ্রোতা দাঁড়িয়ে উঠে করতালিতে অভিনন্দন জানালেন সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে। তিনি বললেন আজ আপনারা আমাদের যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করেছেন, তার উত্তর দেওয়ার জন্য উঠতে গিয়ে আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সব ধর্মের যিনি প্রসূতিস্বরূপ, তাহার নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।'

সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। স্বামীজি বললেন আমরা শুধু সকল ধর্মকেই সহ্য করি না। সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে আসছে। আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গর্বিত মনে করি। পৃথিবীতে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসম্মেলন এ ধর্ম মহাসভা যা গীতায় প্রচারিত ভগবানের সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছে— "যে যে ভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।" সেইদিন দৈবশক্তির অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন ধর্ম মহাসভার মূল নায়ক। পাশ্চাত্য জগতের কাছে স্বামীজিকে পরিচয় করে দিয়েছিলেন এই ধর্ম মহাসভা। সেইদিন মাত্র পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় উপস্থিত সবার হৃদয়ে জায়গা নিয়েছিলেন তিনি এবং সেই বক্তৃতা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রথম দিনে বক্তৃতাটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ অপরাহ্নে ধর্ম মহাসম্মেলনের পঞ্চম দিনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ ধর্মের প্রাধান্যের জন্য বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। অবশেষে স্বামীজি একটি সুন্দর কুয়োর ব্যাঙের গল্প বলে সকলের মুখ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন "সংকীর্ণ ভাবনাই আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির কারণ"। স্বামীজি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ শিকাগোর মহাসম্মেলনের ভাষণে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এক নতুন বার্তা— "মানুষকে পাপী বলাই পাপ" শুনিয়ে সবাইকে এক তীব্র ভাবাবেগে আচ্ছন্ন করেছিলেন।

সেইদিন স্বামীজি হিন্দু ধর্ম বিষয়ক এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরেন। বিশ্ববাসীর নিকট হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে এক অপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত ঐতিহাসিক এই ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অবিসংবাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ বক্তা। স্বামীজির আধ্যাত্মিকতার শক্তি আমেরিকাবাসীদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ দশমদিনে শ্রোতারা বিবেকানন্দের কাছ থেকে অপূর্ব এক আলোচনা শুনতে পেলেন, "ভারতে ধর্মের অভাব নেই, সেখানে দারিদ্র্য দূর করা চাই। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্যে তোমাদের নিকট সাহায্য চাইতে আসিয়াছি।" ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ধর্ম সম্মেলনের শেষদিনে স্বামীজি বলেছিলেন— "প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টি লাভ করবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।" যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাহার ধর্ম টিকিয়া থাকিবে। তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। এই শিক্ষাই গভীরভাবে পাশ্চাত্যবাসীর মনে গৃহীত হয়েছিল। একথা ঠিক যে হিন্দু ধর্মের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজি বিশ্বজনীন ধর্মের কথাই বলেছিলেন। শিকাগো ভাষণের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেন— ধর্মসভায় অন্যান্য বক্তারাও প্রত্যেকে ঈশ্বরের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে ঈশ্বর ছিলেন তাদের নিজের ঈশ্বর। তাদের নিজের সম্প্রদায়ের ঈশ্বর। কিন্তু বিবেকানন্দ---একা বিবেকানন্দ বলেছিলেন তাদের সকলের ঈশ্বরের কথা সকলের ঈশ্বরকে তিনি বিশ্বসত্ত্বায় মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এইখানেই স্বামীজির স্বার্থকতা, হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি স্বামীজির মহানুভবতার পরিচয়। অসীম সমুদ্র স্বামীজির কথার শেষ নাই। যে ঈশ্বরকে তিনি দেখিয়েছেন এইবলে "বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" জয়তু স্বামীজি, জয়তু তোমার বাণী। তোমার চরণে শতকোটি প্রনাম।

আলোচনা

জীবনের পরশমণি

প্রণয় কুমার রায় বর্ধন

জলের আরেক নাম জীবন। কিন্তু সারা পৃথিবীজুড়ে এই জলই এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজ খুললে দেখা যায় জলের জন্য হাহাকার। এই জলের জন্য শুধু অবরোধ। কখনো বা জাতীয় সড়ক। কখনো বা অন্য কোথাও। এই জল কষ্টের অন্যতম কারণ বিশ্বব্যাপী প্রবল জনবিস্ফোরণ। উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া জলদূষণ। বিজ্ঞান- প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও মানুষের চাহিদা ভোগবিলাসিতার প্রবল বৃদ্ধির কারণে প্রকৃতির উপর আজ সাঁড়াশি আক্রমণ নেমে এসেছে। প্রবল দূষণের শিকার এই জল, মাটি, বায়ু। এখন কলের জল কতটা নিরাপদ এ নিয়েও সংশয় দানা বেঁধে উঠেছে। আবার আজ এই ধরনের গভীর ও অগভীর জলের উৎসের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে আর একটি বড় বিপদ সামনে এসে পড়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল তোলার কারণে মাটির নিচের জলস্তর অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে নেমে গেছে। মোবাইল ফোনের চার্জ কমে এলে যেমন রিচার্জ করতে হয়, তদ্রুপ এখানেও সে কাজটা করা খুব প্রয়োজন। অথচ মাটির তলায় জল পাঠানো বা 'রিচার্জিং অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার'-এর তেমন উদ্যোগ বা ব্যবস্থাপনা নেই বললেই চলে। আবার যথেচ্ছ নলকূপ বসানোর নিষেধাজ্ঞা এলেও মানছে না কেউই। কিছুদিন আগে নাসার একটি অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, এ সময় পৃথিবীর দ্বিতীয় অন্যতম জল কষ্টের জায়গা পেতে চলেছে ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানার শতদ্রু অববাহিকা অঞ্চল। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন প্রতি তিন বছরে এক মিটার করে নেমে যাচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ জলতল। যা খুবই উদ্বেগের। যেভাবে ভূ-গর্ভস্থ জল টেনে তোলা হচ্ছে এতে বিজ্ঞানীদের অভিমত, ২০৩০ সালে দেশের ৬০ শতাংশ জনগোষ্ঠী গভীর জল সংকটে পড়বে এবং ব্যাপকভাবে মার খাবে কৃষি উৎপাদন।

জলের জন্য হাহাকার। বিশ্বব্যাপী সরকারি জলের কলে এক বেলা জল না এলেই কর্তৃপক্ষের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে গালাগাল। অভিযোগ অজস্র। কেন জলের স্পিড নেই। কলে আধ ঘণ্টাও জল থাকে না। বছর তিনেক আগেরই একটি বাস্তব ঘটনা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবশ্যিক সারাইয়ে সেবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গোমতীর জল আটকে রাখতে হয়। দু'দিন না যেতেই নিম্নাঞ্চলের জনগণের মধ্যে হাহাকার দেখা দেয়। দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে গোমতী তখন মরা গাঙের রূপ নিয়েছিল। যদিও গোমতী আজও তথৈবচ। আবশ্যিক সারাইয়ের প্রয়োজনে জল আটকে রাখায় সমস্যা আরও কঠিন আকার ধারণ করে। জলের উৎসকে দূষণমুক্ত রাখার মতো আবশ্যক দায়ভার বহনে সর্বস্তরের জনগণেরই কম বেশি উদাসীনতা রয়েছে। তেমনি "রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং" বা বৃষ্টির জল সংরক্ষণের বেলাতেও। বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং তা থেকে সেচ কিংবা শুকনো মরশুমে কাজ চালানো কোথায় ততটা উদ্যোগ? কোথাও

কোথাও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বটে তবে দেখা গেছে তেমন টেকসই কিংবা পরিবেশবান্ধব নয়। কখনও স্থান নির্বাচনে ভুল কখনও বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ। ইত্যাদি নানা ত্রুটি। বলা যায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার আব্যশিকতা নিয়ে অজস্র তত্ত্ব কথা বলে আজও আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নি।

জলাভাব ও জল দূষণের জন্য গভীর সংকটে সমগ্র বিশ্ববাসী, দেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্যও। উৎকণ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। সমগ্র বিশ্ববাসীই আজ তীব্র জলাতঙ্কে ভুগছে। জলাভাবেই কি বিনাশ ঘটবে জীবকুলের? বছর তিনেক আগেই চেন্নাইয়ে বেসরকারি ট্যাঙ্কের জল এক গ্রাম সোনার থেকে বেশি দাম দিয়েই নাকি কিনতে হয়েছিল। সে বছর সমগ্র তামিলনাড়ুতেই ৪১ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছিল। তেমনি সে বছরই জলের ট্যাঙ্কারে প্রতিদিন পুলিশি পাহারা বসাতে হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশেও গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছিল। দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা এবং বিহারেও। ২০১৮ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত আইপিসিসি বা রাষ্ট্রসংঘের ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জের প্রতিবেদনে রয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এভাবে বিশ্বের তাপমাত্রা যদি বাড়তেই থাকে, তবে পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার সমস্ত বরফই একদিন গলে যাবে। নতুন করে অ্যান্টার্কটিকায় তখন আর জমবে না বরফ। এ থেকে আর দুই ডিগ্রি বাড়লেই গ্রীনল্যান্ডের সব হিমবাহই গলে যাবে। আমাজনের গভীরতম ঘন বন তীব্র খরার কবলে পড়ে শুকিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ২১০০ সাল নাগাদ সেটা বেড়ে যেতে পারে আরও তিন মিটার। এতটা বাড়বে পৃথিবীর উষ্ণতা যা সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও মানুষেরই নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাবে পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। পৃথিবীর সমস্ত সুপেয় জলের উৎস সেদিন শুকিয়ে যাবে। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই ও হায়দরাবাদের মতো ভারতের ২১ টি শহর আরও তীব্র জল সংকটে পড়বে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এসব শহরের ভূ-গর্ভস্থ জল শেষ হয়ে যাবে। ফলে প্রায় ১০ কোটি মানুষ মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হবেন। ব্যাপকহারে বন ধ্বংস, শিল্প, কৃষি ও নির্মাণ ইত্যাদি নানা মনুষ্যঘটিত কর্মকাণ্ডে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ মাত্র স্থল। মোট জলের ৯৭ শতাংশই সমুদ্রের নোনাজল। স্বভাবতই পানযোগ্য নয়। বাকি তিন শতাংশের মধ্যে দুই শতাংশ বরফ হয়ে হিমবাহ বা অন্য জায়গায় জমে রয়েছে। ফলে মানুষের ব্যবহারের জন্য রয়েছে শুধুমাত্র এক শতাংশ। ১৮০ কোটি মানুষ প্রতিদিন দূষিত জল পান করে থাকেন। এতে ডায়েরিয়া, কলেরার মতো রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। নোংরা জলের ব্যবহারে প্রতি বছর সারা বিশ্বে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষ মারা যান। ভারতেই প্রতিদিন ডায়েরিয়ায় মারা যায় ১৫০০ শিশু।

জল এই মুহূর্তে এক অত্যন্ত লোভনীয় ব্যবসার ক্ষেত্র। রাষ্ট্রসংঘের তথ্যে জানা গেছে বেসরকারি জল সরবরাহকারীরা সরকারি মূল্যের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি দাম নিচ্ছে। বিশ্বের পানীয়ের বাজারের ক্ষেত্রে বোতলের জলের ব্যবসাই সবচেয়ে বাড়বাড়ন্ত। বিশ্বে বোতল জলের বাজার বাড়ছে বছরে ৪.৫ শতাংশ। সেখানে ভারতে বেড়েছে অবিশ্বাস্যভাবে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ।

ভারতের আয়তন সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের মাত্র দুই শতাংশ। অথচ বিশ্ব জনগোষ্ঠীর ১ শতাংশের বাস ভারতে। পাশাপাশি বিশ্ব জীব গোষ্ঠীর ১৫ শতাংশের বাসও ভারতে অথচ বিশ্বের মোট জলরাশির মাত্র ৬ শতাংশ ভারতে। জলের পরিমাণের বাস্তবতার নিরিখে পৃথিবীর ১৮০ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৩। আর ব্যবহৃত জলের গুণমানের নিরিখে ১২২ টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান নাকি ১২০ তম। আমাদের আগরতলার দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল থেকে মোট ২৬১ টি জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয় ৮১ টি পয়েন্ট থেকে, দেখা

গেছে প্রতিটি জলের নমুনাতেই আয়রনের অস্বাভাবিক উপস্থিতি এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক উপাদান। যেখানে ভারতীয় স্টান্ডার্ড (Standard) অনুযায়ী একেবারেই থাকার কথা নয়। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে টেপ পয়েন্টে ক্লোরিনের মাত্রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বেগজনকভাবে বেশি। ভারতীয় Standard অনুযায়ী জলে ক্লোরিনের মাত্রা যেখানে ০.০৯ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা নয়। সেক্ষেত্রে আগরতলাতে এটা গড়ে ২ শতাংশ। অতিরিক্ত ক্লোরিন সেবনে মানব দেহে হেপাটাইটিস, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত আয়রন সেবনে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন পেটের রোগ, গ্যাসট্রিক আলসার ইত্যাদি। বেসরকারি এক সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু জিবি হাসপাতালেই প্রতিদিন গড়ে ৯৫ থেকে ১০০ জন লোক বিষাক্ত পানীয় জল থেকে সৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসিত হচ্ছেন। জিবি হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মহলের মতে তাদের এখানে চিকিৎসার জন্য আসা বিপুল সংখ্যক রোগীর মধ্যে গড়ে প্রায় ৮০ শতাংশই পেটের রোগী।

এছাড়াও দক্ষিণ ত্রিপুরার জলে রয়েছে আয়রন ৫১.৫ শতাংশ, ম্যাঙ্গানিজ ২৬.৯ শতাংশ এবং আর্সেনিক ৬.৩৫ শতাংশ আজও দেশের ৬০ শতাংশ কৃষিভূমি নির্ভরশীল জলসেচের উপর। ৭৫ শতাংশ ভারতীয় জলে আছে লোহা। ৮৫ শতাংশকে নির্ভর করতে হচ্ছে ভূমিতলের জলের উপর। স্বভাবতই সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে বলাই যায়। যদি না সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝতে হবে জলই জীবনের পরশমণি। জলাধার বানাতে হবে সর্বত্র। বৃষ্টির জল ধরে রাখতেই হবে যতটা সম্ভব। নতুবা সামনে মহাবিপদ। জল অপচয় একশ শতাংশ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজন জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। বোঝাতে হবে জলের জন্যই প্রকৃতি। মনে রাখতে হবে জলের উপর নির্ভর করছে প্রকৃতি। আগামীদিনে ব্যবহারযোগ্য জলের প্রবল সংকট ও জলের দূষণ এই গ্রহের তথা বিশ্বের সমস্ত জীব কূল বিশেষ করে মনুষ্যকুলের যে মহাবিপদ নেমে আসছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আর যাই-ই হোক জীবকুলের অস্তিত্বের সুরক্ষায় জলের উৎসকে দূষণ মুক্ত রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

খুবই উদ্বেগের ঘটনা ভারতের জনপ্রতি বরাদ্দ জলের পরিমাণ কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫৪৫ কিউবিক মিটার। ২০১৮ সালের এক তথ্য অনুযায়ী শীঘ্রই পৃথিবীর ২০০ টি শহর জলশূন্য হতে চলেছে। এমনই প্রথম দশটি বড় শহরের মধ্যে রয়েছে ভারতের ব্যাঙ্গালুরু। বিজ্ঞান এখনও জলের সহজলভ্য বিকল্পের সন্ধান দিতে পারেনি। জল অপচয় ও দূষণের কারণেই মানুষের দুর্ভোগ দিন দিন গভীর হচ্ছে।

চিকিৎসা

গর্ভধারণের প্রস্তুতি
বা প্রিকনসেপশনাল কাউন্সেলিং

ডা: অপরাজিতা পাল

গর্ভধারণের প্রস্তুতি বা প্রিকনসেপশনাল কাউন্সেলিং কথাটার সঙ্গে খুব একটা পরিচিত না হলেও এর গুরুত্ব অনেক। গর্ভধারণের আগেই কোনো দম্পতি যখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং আসন্ন গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে কী কী সমস্যা হতে পারে এবং কীভাবে তা সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তাকে প্রিকনসেপশনাল কাউন্সেলিং বলে। এর মূল লক্ষ্য হলো একজন হবু মায়ের সন্তান ধারণের আগে সম্পূর্ণ সুস্থতা নিশ্চিত করা এবং সুস্থ সন্তানের জন্মদান, গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী জটিলতা কমানো।

কারণ, মেয়েদের অনেকের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হরমোনজনিত সমস্যা, রক্তশূন্যতা, জিনগত বিভিন্ন সমস্যা থাকে। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি হয়তো জানেন না। এ অবস্থায় সন্তান ধারণ করলে গর্ভস্থ শিশু ও মায়ের নানা জটিলতা হতে পারে। গর্ভধারণের অন্তত তিন মাস আগে প্রিকনসেপশনাল কাউন্সেলিং শুরু করা যেতে পারে।

প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব

গর্ভাবস্থা থেকে অভিভাবক হয়ে ওঠার এই যাত্রা প্রায় সকল পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের এক মূল্যবান সময়। একটি সমীক্ষা অনুসারে, গর্ভবতী নন এমন মহিলাদের তুলনায় গর্ভবতী মহিলারা বেশি সুখী হন। যদিও, বিশ্বব্যাপী ৪০% এরও বেশি প্রেগন্যান্সি অপরিকল্পিত ভাবে আসে। তথ্যের অভাব এবং চিকিৎসাগতভাবে তত্ত্বাবধান না করা প্রেগন্যান্সিগুলি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা মা এবং তার শিশুর শরীর স্বাস্থ্যকে সমস্যায় ফেলতে পারে। অতএব, প্রজননক্ষম হয়ে ওঠা সমস্ত মহিলা এবং পুরুষদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য

পরিচর্যার একটি অংশ হিসাবে প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং অপরিহার্য বিষয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তথা WHO -এর মতে, "গর্ভধারণ এর আগে প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং মহিলাদের এবং দম্পতিদের বায়োমেডিক্যাল, আচরণগত (life style) এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলি বিবেচনা করে গর্ভধারণ এর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত"। প্রেগন্যান্সিকে জটিল করে তুলতে পারে বা শিশুকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে এমন সমস্ত চিকিৎসা এবং সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করাই প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ারের লক্ষ্য। শুধুমাত্র বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়, কিশোরী মেয়েদের ক্ষেত্রেও, রিপ্রোডাকটিভ হেলথকে নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রিকনসেপশন কাউন্সেলিং এর উপকারিতা

প্রিকনসেপশন কাউন্সেলিং-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করা এবং আপনার এবং আপনার শিশুর জন্য কম স্বাস্থ্যকর ফলাফলে অবদান রাখতে পারে এমন যে কোন কারণ হ্রাস করা। প্রিকনসেপশন কাউন্সেলিং গর্ভাবস্থার আগে আপনাকে বা আপনার শিশুকে প্রভাবিত করতে পারে এমন রোগ এবং ব্যাধিগুলি সনাক্ত এবং চিকিৎসা করার একটি উপায় প্রদান করে।

প্রিকনসেপশন কাউন্সেলিং এর অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছেঃ

- শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কম করা,
- গর্ভাবস্থায় জটিলতা রোধ করা,
- প্রসবের সময় জটিলতা রোধ করা,

মৃত সন্তান জন্মদান প্রতিরোধ করা, pre-term প্রসব যন্ত্রণা রোধ করা, এবং pre-term প্রসব রোধ করা, কম ওজনের শিশু জন্ম ঠেকানো,নবজাতকের ইনফেকশন রোধ করা, STDs/এইচআইভি সংক্রমণ রোধ করা ইত্যাদি।

প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিংয়ে উদ্বেগের বিষয়ঃ

প্রেগন্যান্সিকে জটিল করে তুলতে পারে এমন সমস্ত চিকিৎসাগত, সামাজিক এবং আচরণগত সমস্যাগুলি প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং মোকাবিলা করে। একটি আদর্শ প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ার চেকলিস্ট নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সমাধান করে:

- মায়ের পুষ্টির অবস্থা
- তামাক খাওয়া এবং মদ্যপান

- বংশধারার জিনগত ব্যাধি
- স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধিকে বিপন্নকারী পরিবেশগত সমস্যা
- কোকেনের মতো মাদক পদার্থের অপব্যবহার
- HIV এবং হেপাটাইটিসের মতো সংক্রমণের উপস্থিতি যা গর্ভাবস্থার মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে, এবং
- সামাজিক সমস্যাগুলি, যেগুলির মধ্যে রয়েছে মহিলাদের যৌনাঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, হিংসা ও নির্যাতন এবং মানসিক স্বাস্থ্য।

ধারাবাহিক গর্ভপাত এবং ভ্রূণের বিকাশে ব্যর্থ রোগীদের জন্য অতিরিক্ত জেনেটিক কাউন্সেলিং, ক্যারিওটাইপিং, শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষা, বন্ধ্যাত্ব নির্ণয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সমাধান

ব্যাপক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং তদন্তের পরে, প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ারের প্রশ্নগুলির সমাধান করা প্রয়োজন। এক দম্পতিকে তাদের উদ্বেগের সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ারের মাধ্যমে প্রবর্তিত উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপগুলি নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ—

পুষ্টি

কম BMI বা উচ্চ BMI ভবিষ্যৎ প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে সমানভাবে ক্ষতিকারক। প্রেগন্যান্সি শুরু হওয়ার আগে রক্তশূন্যতা, ভিটামিন D এবং ভিটামিন A-র মতো পুষ্টির ঘাটতিগুলিকে অবশ্যই শুধরে নিতে হবে এবং প্রেগন্যান্সি চলাকালীন তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পাস্তুরাইজ করা নয় এমন দুগ্ধজাত খাবার, ক্যাফিন, এবং অপরিশোধিত ফল খাওয়া মহিলাদের এড়িয়ে চলা উচিত। ট্যাবলেটের মাধ্যমে ফলিক অ্যাসিড, আয়রন এবং ভিটামিনের সাপ্লিমেন্ট শিশুর স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে পারে।

জীবনযাত্রায় পরিবর্তন

প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ার চেকলিস্ট গর্ভধারণের চেষ্টারত মহিলাদের মধ্যে মদ্যপান এবং তামাকের ব্যবহারকে সীমিত করে। ক্যাফিন নেওয়া কমানোর সাথে সাথে মহিলাদের প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে। কোকেন এবং হেরোইনের মতো অবৈধ মাদকে আসক্ত মহিলাদের মধ্যে মাদক পদার্থের অপব্যবহার বন্ধ করা উচিত এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত।

সংক্রমণ এবং ভ্যাকসিন

মায়েদের সংক্রমণ যেমন রুবেলা, টক্সোপ্লাজমোসিস, HIV এবং হেপাটাইটিস জরায়ুতে থাকার সময় বা প্রসবের সময় শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। এটি শিশুর এবং মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে পারে। অতএব, মায়ের চিকিৎসা না হওয়া সমস্ত সংক্রামক রোগগুলির নিরাময় করা অপরিহার্য। উপরন্তু, ভ্যারিসেলার মতো ভাইরাসের ভ্যাকসিনগুলি ভবিষ্যতে সংক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে প্রদান করা যেতে পারে। প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিছু কিছু ভ্যাকসিন শুধুমাত্র গর্ভাবস্থার আগে দেওয়া যায় এবং তাই সেগুলিকে গর্ভাবস্থায় দেওয়া উচিত না। সুতরাং, সময় থাকতে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলা নিশ্চিত করে যে আপনার জীবনের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ এই ধরনের সংক্রামক প্রক্রিয়া থেকে আপনি মুক্ত।

দীর্ঘস্থায়ী রোগ

দীর্ঘস্থায়ী রোগ যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি সহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত মহিলাদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ার প্রশ্নগুলি রোগীর মধ্যে এই ধরনের রোগগুলির বর্তমান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে যে সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে উত্তর দেয়। এই রোগগুলির যখন যত্ন নেওয়া হয় না, তখন সেগুলি জরায়ুস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে এবং বিভিন্ন মাত্রার বিকাশগত বিলম্ব এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতা সহ কম বা বেশি ওজনের একটি শিশু হতে পারে।

প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিংয়ের সময়, রোগীর বর্তমানে ব্যবহার করা ওষুধের মূল্যায়ন করা হয়।

বন্ধ্যাত্ব এবং অন্যান্য পারিবারিক সমস্যা

একটি সফল প্রেগন্যান্সির জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ। যে দম্পতি বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভুগছেন এবং গর্ভধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে মানসিক এবং সামাজিক চাপের মোকাবিলা করতে হয়, যা সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। প্রি-কনসেপশনাল কাউন্সেলিং এই ধরনের দম্পতিদের অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজিগুলি যেমন IVF ব্যবহার করার অনুমতি তোলে।

উপরের সমস্ত বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করা ছাড়াও, প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ার বংশগত রোগ, এন্ডোক্রিন-সংক্রান্ত ব্যাধি সামলায় এবং ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিনিংয়ের বন্দোবস্ত করে।

কাদের প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং করানো উচিত

প্রি-কনসেপশনাল কাউন্সেলিং এবং কেয়ার শুধুমাত্র বিবাহিত দম্পতিদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিশোরী মেয়েদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কিশোর-কিশোরীদের এই কাউন্সেলিং করানো উচিত যাতে তারা গর্ভনিরোধক পদ্ধতি এবং গর্ভপাত ও প্রসবপূর্ব যত্ন পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারে। বেশি বয়সের (> ৩৫ বছর) মহিলাদেরকে শিশুর জিনগত ত্রুটির অতিরিক্ত ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা উচিত।

গর্ভধারণের আগে যা করতে হবে

উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাইপো থাইরয়েডের মতো রোগ অনিয়ন্ত্রিত থাকলে গর্ভপাত হতে পারে, গর্ভাবস্থায় শিশু মারা যেতে পারে, ওজন কম বা বেশি হতে পারে, শিশুর বুদ্ধি বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে, জন্মের সময় ও পরবর্তীকালে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি মায়ের নিজেরও নানা জটিলতা হতে পারে। এসব ঝুঁকি শনাক্তের পর যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণের পরই গর্ভধারণ করা উচিত।

- রুবেলা ও হেপাটাইটিসের টিকা নেওয়া না থাকলে তা নিতে হবে।
- গর্ভধারণের এক মাস আগে থেকে এবং গর্ভধারণের তিন মাস পর্যন্ত প্রতিদিন ৪ মিলিগ্রাম করে ফলিক অ্যাসিড খেতে হবে। এটি শিশুর জন্মগত ত্রুটি হওয়ার ঝুঁকি কমায়।
- মায়ের অতিরিক্ত ওজন, কম ওজন, রক্তশূন্যতা এগুলো ঠিক করে এরপর গর্ভধারণ করা উচিত।
- কেউ যদি আগে থেকে ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, খিঁচুনি, ঘুম বা মানসিক সমস্যা, থাইরয়েড ইত্যাদি রোগের ওষুধ সেবন করে থাকেন, তাহলে তা অব্যাহত রাখবেন কিনা, তা জেনে নিতে হবে।
- গর্ভধারণের যে ভয় বা উৎকণ্ঠা থাকে, তা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে দূর করা।
- পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ, নিয়মিত শরীরচর্চা করা এবং ধূমপান বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা। জিনগত রোগের স্ক্রিনিং টেস্ট করা এবং এর ঝুঁকি নিয়ে অবহিত করা। প্রসবের সময়, প্রসবের পদ্ধতি, কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজন, সে বিষয়ে অবহিত করা। যাদের বারবার গর্ভপাত হয় বা খারাপ ইতিহাস আছে, তাদের সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কারণ খুঁজে না বের করে আবার গর্ভধারণ করা অনুচিত।

উপসংহার

সুতরাং, জনসাধারণের এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ার অপরিহার্য। উন্নত দেশগুলিতে প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ পর্যাপ্তভাবে দেওয়া হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের প্রশাসনিক কাঠামোকে পুনরায় সাজাতে হবে যাতে সবাই প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং পরিষেবাগুলির সুযোগ পেতে পারে। নবজাতকের এবং মায়ের মৃত্যুর হারে উন্নতি এবং স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত বা মিসক্যারেজ প্রতিরোধ করাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় যার দ্বারা প্রি-কনসেপশন কাউন্সেলিং এবং কেয়ার জনগণকে সেবা দিতে পারে।

With Best Compliments From ....

PARITOSH DEBNATH

Govt. Contractor & Order Suppliers

Office : Ranir Bazar, Debinagar

Happy Durgapuja

ভ্রমণ

বেড়াতে আসুন পড়শি দেশে

রফিকুল ইসলাম সবুজ

সীমান্তের কাঁটাতার ভারত-বাংলাদেশকে পৃথক করেছে বটে, কিন্তু বাঙালির মনে প্রাণে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের সহযোগিতা বিশেষ করে ত্রিপুরার মানুষ বাংলাদেশের মানুষের পাশে থেকে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তা এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বাংলাদেশ। তাই ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের একটা হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। একারণেই বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ ত্রিপুরায় বেড়াতে যান। একইভাবে ত্রিপুরার মানুষও খুব সহজে বাংলাদেশে বেড়াতে আসতে পারেন। কারণ এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভাল হয়েছে ত্রিপুরার সঙ্গে ঢাকার। তাছাড়া পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর ত্রিপুরা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতা যাওয়াও অনেকটা সহজ হয়েছে। আগরতলা থেকে ঢাকায় সরাসরি বাস সার্ভিস চালু হয়েছে অনেক আগেই। আর কিছুদিন পর আগরতলা থেকে ঢাকার সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগও চালু হতে যাচ্ছে। তাই ঢাকা থেকে আগরতলায় বেড়াতে যাওয়া যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি ঢাকায় বেড়াতে আসাও ত্রিপুরার মানুষের জন্য খুব সহজ হয়েছে। যে কোন সময় খুব অল্প খরচে আপনি চাইলে পরিবার নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসতে পারেন।

ত্রিপুরার গ্রাম বাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার প্রকৃতিগতভাবে বিশেষ পার্থক্য নেই। মানুষের জীবনযাত্রাও প্রায় এক। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বরাবর থাকা গ্রামগুলির সঙ্গে এদেশের গ্রাম বাংলার পার্থক্য করা খুব কঠিন। মানুষজনের মধ্যে আন্তরিকতাও রয়েছে যথেষ্ট। অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন এবং বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান রয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অখণ্ড বনভূমি সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, বিখ্যাত মণীষীদের জন্মভিটে ছাড়াও রয়েছে বহু ঐতিহাসিক স্থান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

রাজধানী ঢাকা থেকেই ভ্রমণ শুরু করতে পারেন। এখানে থাকার জন্য বিভিন্ন বাজেটের অসংখ্য হোটেল, মোটেল, কটেজ, বাংলো এবং রেস্তোরাঁ রয়েছে। বেড়ানোর জন্য গাড়ি ভাড়া পাবেন। তবে ঢাকায় যাতায়াতের সময় হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে বেরোতে হবে। কারণ এখানকার যানজটের সমস্যা ভয়ানক। আগরতলা থেকে সরাসরি বাসে ঢাকায় আসতে পারেন। আর চাইলে বর্ডার পার হয়ে আখাউড়ায় এসে ট্রেনেও ঢাকায় আসতে পারেন। তবে পরিবার নিয়ে এলে সরাসরি বাসে আসাটাই ভাল। ঢাকায় কমলাপুর বিআরটিসি বাস টার্মিনালে নেমে আপনি কাছাকাছি পল্টন, মতিঝিল এলাকায় কোন হোটেলে থেকে ঢাকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে পারবেন।

বাংলাদেশের খাবারের স্বাদ অতুলনীয়। পদ্মার ইলিশ মাছের স্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, মাংসের নানা পদ, শুঁটকি মাছ, ভর্তা ইত্যাদি খেয়ে দেখতে ভুলবেন না। বাংলাদেশের মুদ্রাকেও টাকা বলে। মতিঝিল ব্যাংক এলাকা অথবা পুরানো পল্টন বায়তুল মোকাররম মসজিদ এর সামনে অনেক মানি এক্সচেঞ্জ রয়েছে সেখান থেকে ভারতীয় মুদ্রার পরিবর্তে বাংলাদেশের টাকা সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া পুরাতন ঢাকার তাঁতি বাজার এলাকায়ও মানি এক্সচেঞ্জ রয়েছে। তবে ঢাকায় আসার আগে আগরতলা থেকে কিছু রুপি পরিবর্তন করে বাংলাদেশি টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসা উচিত। তাহলে আপনাকে ঢাকায় পৌঁছেই রুপি ভাঙানোর প্রয়োজন হবে না। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে ঘড়ির কাঁটা কিন্তু আধ ঘণ্টা এগিয়ে থাকে। বাংলাদেশের যেখানেই বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করুন না কেন, আগে ঢাকায় দু' একদিন ঘুরে তারপর অন্য জায়গায় যাওয়া ভাল। ঢাকায় প্রবেশ করার পর যানজটের সম্মুখীন হতে পারেন বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। তাই কোথাও যাওয়ার আগে হাতে

সময় নিয়ে বের হতে ভুলবেন না।

ঢাকা শহরের মধ্যেই আপনি অনেক জায়গা ঘুরে দেখতে পারেন। এর মধ্যে জাতীয় জাদুঘর অন্যতম। রাজধানী ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত জাদুঘরে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক জিনিস সংরক্ষিত আছে। শিশুদের জন্য এটি একটি বিনোদনের জায়গা। নতুন অনেক কিছু তারা দেখতে পারবে, উপভোগ করতে পারবে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ২০ মার্চ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় জাদুঘরের প্রতি টিকিটের মূল্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ২০ টাকা ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১০ টাকা এবং সার্কভুক্ত দর্শনার্থীদের জন্য জাদুঘর পরিদর্শন করতে ৩০০ টাকা লাগবে। জাতীয় জাদুঘরের পাশেই রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও আপনি ঘুরে দেখতে পারেন।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ভেতরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার রয়েছে। কাছাকাছি রয়েছে রমনা পার্ক। পার্কটির মধ্যে রয়েছে প্রচুর গাছ। পার্কটি সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রতিবছর এখানে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ঢাকাবাসীর জন্য সকালের ভ্রমণের মূল কেন্দ্র এই পার্কটি। বিশাল পরিমাণ জায়গা থাকার ফলে এখানে কয়েক হাজার মানুষ সকাল বিকালে হাঁটতে পারেন। এর পাশেই রয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এই উদ্যানের মধ্যেই রয়েছে ঐতিহাসিক রমনা কালিমন্দির। এছাড়া ঢাকার ভেতরেই রয়েছে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির। প্রাচীন আমলের এ মন্দিরটিও দেখতে যান পর্যটকরা। এছাড়া ঢাকায় ঘোরার জায়গা বা বিনোদনের জন্য মিরপুরে অবস্থিত চিড়িয়াখানা অন্যতম। শিশুরা চিড়িয়াখানায় যেতে অনেক পছন্দ করে। তাই বাচ্চাদের নিয়ে ঢাকায় ঘোরার জায়গাগুলোর মধ্যে চিড়িয়াখানা হতে পারে অনেক আনন্দময়। টিকিটের মূল্য সাধারণত জনপ্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা হয়ে থাকে। শিশুদের জন্য টিকিটের দাম ২০ টাকা। চিড়িয়াখানার পাশেই রয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেন। এছাড়া ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি যেটি এখন বঙ্গবন্ধু জাদুঘর করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর দেখার পর পাশেই রয়েছে ধানমন্ডি। বঙ্গবন্ধু যাদুঘর থেকে খুব কাছেই জাতীয় সংসদ ভবন। লুই আইকানের স্থাপত্য নকশায় নির্মিত সংসদ ভবন দেখতে ভুল করা যাবে না। আর সংসদ ভবনের পাশে রয়েছে নভো থিয়েটার এবং সেনাবাহিনীর যাদুঘর।

ঢাকায় ঘোরার জায়গাগুলোর মধ্যে আহসান মঞ্জিল অন্যতম। পুরাতন ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত আহসান মঞ্জিল ব্রিটিশ আমলে ঢাকার নবাব পরিবারের আবাসস্থল ছিল। খাজা আলিমুল্লাহ ১৮৩০ সালে ফরাসিদের কাছ থেকে এটি ক্রয় করে সংস্কার করে নিজের বাসস্থান হিসেবে উপযোগী করে তোলেন। ঢাকা শহরের প্রথম ইট-পাথরের তৈরি স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে আহসান মঞ্জিলকে ধরা হয়। আহসান মঞ্জিলের রংমহলের ২৩ টি কক্ষে ৪ হাজার ৭৭ নিদর্শন রয়েছে। পরবর্তীতে নওয়াব আবদুল গনি ১৮৩৯ সালে সংস্কার করে তার পুত্র খাজা আহসানউল্লাহ নাম অনুসারে এটি নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল। টিকিটের দাম সার্কভুক্ত দেশীয় দর্শকদের জন্য ৩০ টাকা। এছাড়া পুরাতন ঢাকায় লালবাগ কেল্লা যেতে পারেন। প্রাচীন এই দুর্গটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। ঢাকা শহরে আগারগাঁও এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাদুঘর অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের প্রথম বিমান জাদুঘর। এখানে মূলত বিভিন্ন সময়ের হেলিকপ্টার ও বিমান দিয়েই এই জাদুঘর সাজানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংগ্রহগুলো হল— বলাকা, এয়ার টুওরার, পিটি-৬, ফুগাসি এম-১৭০, গ্লাইডা, এয়ারটেক কানাডিয়ান ডিএইচ ৩/১০০০, হান্টার বিমান। এছাড়া এখানে দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে পার্ক এবং রাইডের ব্যবস্থা। জাদুঘরটি সোম থেকে বৃহস্পতিবার বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং শুক্র থেকে শনিবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। সাধারণের জন্য ৪০ টাকা মূল্যের টিকিট সংগ্রহ করে জাদুঘরে প্রবেশ করা যায়।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকার সাভারে অবস্থিত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ৩৫ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে সাভার উপজেলায় ৪৪ হেক্টর জায়গা নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে স্মৃতি সৌধ কমপ্লেক্স। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের স্মরণে জাতির শ্রদ্ধা নিবেদনের চিরন্তন প্রতীক হিসেবে এই জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের দশটি গণকবর রয়েছে। জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর অনেকে ঘুরতে যান সেতু এলাকায়। পদ্মার পাড়ে মাওয়া ঘাটে বিভিন্ন রেঁস্তোয়ায় পাওয়া যায় ইলিশ। আপনি ইলিশ কেনার পর আপনার সামনেই ভেজে দিবে খাওয়ার জন্য। অনেকে পদ্মার ইলিশ খাওয়ার জন্য মাওয়া ঘাটে বেড়াতে যান। ঢাকা থেকে যেতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টার মতো।

ঢাকায় ঘোরাঘুরির মধ্যে যেতে পারেন বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স-এ। এখানে কেনাকাটা করতে পারেন। পাশাপাশি রয়েছে সিনেকমপ্লেক্স ও দেশি বিদেশি খাবারের রেস্টুরেন্ট। ঢাকার পাশেই গাজিপুরে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক। বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক অবস্থিত। ঢাকা থেকে এই সাফারি পার্ক এর দূরত্ব প্রায় ৪৪ কিলোমিটার। পুরো বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কটি বঙ্গবন্ধু স্কয়ার, সাফারি কিংডম, কোর সাফারি পার্ক, বায়োডাইভার্সিটি পার্ক, এক্সটেনসিভ এশিয়ান সাফারি পার্ক নামক ৫টি অংশে বিভক্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক ৩৬৯০ একর জমির বিস্তৃত। এখানে রয়েছে চিত্রা হরিণ, জলহস্তি, হনুমান, ভল্লুক,

গয়াল, বাঘ, সিংহ, হাতি, সাম্বার, মায়া হরিণ, বানর, কুমির ও বিচিত্র পাখী।

ঢাকার পাশের জেলা নারায়ণগঞ্জে রয়েছে ঈশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁও। ঢাকা থেকে সোনারগাঁও এর দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। একসময় সোনারগাঁওকে স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রাম নামে অভিহিত করা হত। এটি বঙ্গের এক প্রাচীন জনপদ যেখানে, স্বর্ণভূষিত জাতি নামে আদিম জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। সোনারগাঁও এর নামকরণও করা হয় ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামে। সোনারগাঁও এর উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান সমূহ হচ্ছে, পাঁচবিবির মাজার, সোনাবিবির মাজার, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সমাধি, ইব্রাহীম দানিশমান্দ-এর দরগা, শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, পানামনগর, সংগ্রাম ভাস্কর্য, সোনারগাঁও গ্রন্থাগার, জামদানি শাড়ি বিক্রয় কেন্দ্র। সোনারগাঁতে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর এর নাম পানাম নগর যা পানাম সিটি নামেও পরিচিত। সোনারগাঁ ২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই পানাম নগরী। এটা হারানো নগরী হিসাবেও সুপরিচিত।

আর ঢাকায় ঘোরাঘুরি শেষ করে আপনি বাসে সরাসরি চলে যেতে পারেন কক্সবাজার। নীল জলরাশি আর শোঁ শোঁ গর্জনের মনোমুগ্ধকর সমুদ্র সৈকতের নাম কক্সবাজার। অপরূপ সুন্দর বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত এই কক্সবাজার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পর্যটক কক্সবাজার ভ্রমণে আসেন। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণের জন্য আরও রয়েছে ঃ লাবণি পয়েন্ট, হিমছড়ি, ইনানী বিচ। ঢাকা থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৪১৪ কি.মি.। ঢাকা থেকে অনেকগুলো বাস কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। উল্লেখযোগ্য বাসগুলো হলো গ্রিন লাইন, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, শ্যামলী পরিবহণ, সৌদিয়া, এস আলম মার্সিডিজ বেঞ্জ, এস.আলম পরিবহণ, সোহাগ পরিবহণ। এছাড়া আকাশপথে- বিমান বাংলাদেশ, নভোএয়ার, ইউএস বাংলাসহ আরও বেশকিছু বিমান ঢাকা থেকে সরাসরি কক্সবাজার ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। বাসের টিকিট মূল্য নন এসি- ৭৫০ টাকা থেকে ৯০০ টাকা। এসি- ১০০০ থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি সিটের ভাড়া হয়ে থাকে। আকাশপথে ৪০০০ টাকা থেকে শুরু করে ৯ হাজার টাকা পর্যন্ত। কক্সবাজারেই রয়েছে সেন্টমার্টিন দ্বীপ। সেন্টমার্টিন নারিকেল জিঞ্জিরা নামেও পরিচিত। সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এটি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন। এখানে প্রতিদিন প্রচুর পর্যটক আসেন। সারি সারি নারিকেল গাছ এ দ্বীপকে করেছে অনন্য, যা ভ্রমণ পিয়াসী মানুষকে দুর্নিবার আকর্ষণে কাছে টেনে নেয়। ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার আগে রয়েছে চট্টগ্রাম। এখানে ফয়েজ লেক আকর্ষণীয় স্থান। চট্টগ্রামের পাহাড়তলি রেলস্টেশন এর অদূরে খুলশি এলাকায় অবস্থিত একটি কৃত্রিম হ্রদ যা এই ফয়েজ লেক। ঢাকা থেকে ফয়েজ লেকের দূরত্ব প্রায় ২৬৩ কিলোমিটার। আর চট্টগ্রামের জিরো পয়েন্ট থেকে ৮ কিলোমিটার। ৩৩৬ একর জমির উপর এই ফয়েজ লেক অবস্থিত। ফয়েজ লেকে প্রবেশ মূল্য ২৫০ টাকা।

এছাড়া চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার দর্শণীয় স্থান সমূহ হল, ঝরঝরি ঝর্ণা, কমলদহ ঝর্ণা, চন্দ্রনাথ পাহাড় ও মন্দির, সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক, গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত, বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত, কুমিরা ঘাট। আপনার হাতে বেশি সময় থাকলে সুন্দরবন ঘুরতে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রথমে খুলনা হয়ে যেতে হবে সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরবন খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলাজুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অখণ্ড বনভূমি। সুন্দরবনে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক বেড়াতে আসেন। সুন্দরবনে সুন্দরী গাছ ছাড়াও রয়েছে গরান, বাইন, গেওয়া ইত্যাদি। আর প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বাঘ, সিংহ, হরিণ, হাতি, কুমির ইত্যাদি। তবে সুন্দরবনে ঘুরতে গেলে বিভিন্ন ট্যুর প্রতিষ্ঠানের প্যাকেজ এর মাধ্যমে যাওয়াটা সাশ্রয়ী হবে।

খুলনার পাশেই বাগেরহাটে রয়েছে ষাট গম্বুজ মসজিদ। বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন মসজিদ। ঢাকা থেকে ষাট গম্বুজ মসজিদ এর দূরত্ব প্রায় ২৬৬ কিলোমিটার। খান-ই-জাহান আলি ১৫০০ শতাব্দীতে ষাট গম্বুজ মসজিদটি নির্মাণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। ৮১টি গম্বুজ বিশিষ্ট হলেও এটিকে ষাট গম্বুজ মসজিদ নামে নামকরণ করা হয়। ষাট গম্বুজ মসজিদ এর আশপাশে দর্শনীয় স্থান হলো বাগেরহাট জাদুঘর, খান জাহান আলির মাজার, মংলা বন্দর, নয় গম্বুজ মসজিদ।

অন্যদিকে তিন পার্বত্য জেলায় রয়েছে অনেক দর্শনীয় স্থান। রাঙামাটি ঝুলন্ত ব্রিজ ঢাকা থেকে ৩০৮ কিলোমিটার দূরে রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত। রাঙামাটি জেলায় ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ হল রাঙামাটি ঝুলন্ত ব্রিজ! ঝুলন্ত ব্রিজটি কাপ্তাই হ্রদের উপর নির্মিত। এটি প্রায় ৩৩৫ ফুট লম্বা। রাঙামাটি ঝুলন্ত ব্রিজ এর একটি বিশেষ নাম রয়েছে সেটি হল— সিম্বল অফ রাঙামাটি। এই ব্রিজটি কাপ্তাই লেকের বিচ্ছিন্ন দুই পাড়ের পাহাড়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে দিয়েছে। এই ব্রিজ দিয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে অনায়াসেই যাতায়াত করা যায়। রাঙামাটি ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে এসে আপনি আরও যা দেখতে পাবেন তা হল— শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক, শুভলং ঝর্ণা, কাপ্তাই লেক, উপজাতীয় জাদুঘর, ঝুম রেস্তোরাঁ, টুকটুক ইকো ভিলেজ, চিৎমরম গ্রাম ও টাওয়ার, যমচুক্ রাইক্ষ্যং পুকুর, নির্বাণপুর বন ভাবনা কেন্দ্র, ফুরমোন পাহাড়, রাজস্থলী ঝুলন্ত সেতু, রাজবন বিহার, ঐতিহ্যবাহী চাকমা রাজবাড়ি, পেদা টিং টিং, নৌ-বাহিনীর পিকনিক স্পট, ন-কাবা ছড়া ঝর্ণা, আর্যপুর ধর্মোজ্জ্বল বনবিহার, ডলুছড়ি জেতবন বিহার, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র ও কাট্টলি বিল ইত্যাদি।

এছাড়া রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় সাজেক ভ্যালিও ঘুরতে যেতে পারেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন হিসেবে খ্যাত এই সাজেক। রাঙামাটি জেলার সর্বউত্তরের মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত এই সাজেক ভ্যালি। সাজেক ভ্যালি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। ঢাকা থেকে সাজেক ভ্যালির দূরত্ব প্রায় ৩৫১ কিলোমিটার। সাজেকে একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার হচ্ছে— এখানে ২৪ ঘণ্টায় প্রকৃতির তিনটা রূপই দেখতে পাবেন আপনি। কখনো খুবই গরম, পরেই হঠাৎ বৃষ্টি এবং তার কিছু পরেই হয়তো চারদিক ঢেকে যায় মেঘের চাদরে। মনে হয় যেন একটা মেঘের উপত্যকা। সাজেক ভ্যালিতে দেখার মত আরও রয়েছে— রুইলুই পাড়া, কমলক ঝর্ণা, কংলাক পাড়া, হাজাছড়া ঝর্ণা, দিঘিনালা ঝুলন্ত ব্রিজ ও দিঘিনালা বনবিহার। এছাড়া খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানেও রয়েছে অনেক দর্শনীয় স্থান।

খাগড়াছড়ি জেলার দর্শনীয় স্থানগুলো হলো কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদ, আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র, আলুটিলা গুহা, রিছাং ঝর্ণা, জেলা পরিষদ হর্টিকালচার পার্ক (ঝুলন্ত ব্রিজ), মং রাজবাড়ি, গুইমারা, পুরাতন চা-বাগান, দেবতার পুকুর, সিন্ধুকছড়ি পুকুর, বৌদ্ধ মন্দির, রামগড় জঙ্গল, রামগড়, পাহাড় ও টিলা, লক্ষ্মীছড়ি জলপ্রপাত, স্বার্থক, শান্তিপুর অরণ্য কুটির, বিডিআর স্মৃতিসৌধ, রামগড়, হাতিমাথা পাহাড়, খাগড়াছড়ি গেইট, তৈদুছড়া ঝর্ণা, দিঘিনালা ঝুলন্ত ব্রিজ, মায়াবিনী লেক, মাটিরাঙা জলপাহাড়, শতবর্ষী বটগাছ।

ঢাকা থেকে সিলেটেও ঘুরতে যেতে পারেন। এখানে আকর্ষণীয় স্থান হচ্ছে জাফলং। জাফলং ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া-জৈয়ন্তীয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এটা পর্যটকদের জন্য বিখ্যাত জায়গা। বাংলাদেশের সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় এই জাফলং অবস্থিত। ঢাকা থেকে জাফলং এর দূরত্ব প্রায় ২৯৭ কিলোমিটার আর সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার। জাফলং এ রয়েছে ভারতের ডাউকি বন্দরের ঝুলন্ত সেতু। সাথে পাহাড়ি ঝর্ণা, পাথর ও ঝর্ণার সচ্চ পানি। জাফলং এ দেখার মত আরও রয়েছে—লালাখাল, তামাবিল, জৈন্তাপুর, সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণা। ঢাকা থেকে বাসে, ট্রেনে এবং আকাশপথে জাফলং যেতে পারেন। তবে, যেভাবেই যান না কেন আপনাকে প্রথমে সিলেট যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে জাফলং।

সিলেটের শ্রীমঙ্গলও ঘুরতে যেতে পারেন। শ্রীমঙ্গলকে বাংলাদেশের চা এর রাজধানী বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে শ্রীমঙ্গল অবস্থিত। শ্রীমঙ্গলে মোট চা-বাগানের সংখ্যা ৪০টি। সিলেট থেকে শ্রীমঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ৮৩ কিলোমিটার। শ্রীমঙ্গলে দর্শনীয় স্থান গুলো হলো বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ৪০ টি চা-বাগান, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, নির্মাই শিববাড়ি। বিভিন্ন খাসিয়া পুঞ্জি, হাইল হাওরে বাইক্কা বিল অভয়াশ্রম, সীতেশবাবুর চিড়িয়াখানা, কাছারি বাড়ি (সহকারী কমিশনার ভূমি কার্যালয় সংলগ্ন), মসজিদুল আউলিয়া, রমেশ রাম গৌড় এর ৭ কালারের চা, শ্যামলী পর্যটন, মাধবপুর লেক, রাবার বাগান, আনারস বাগান, লেবু বাগান, ভাড়াউড়া লেক, রাজঘাট লেক, মাগুরছড়া গ্যাসকূপ, পান পুঞ্জি, ওফিং হিল, বার্নিস টিলার আকাশ ছোয়া সবুজ মেলা, শ্রীমঙ্গলের এক মাত্র ঝর্ণা "যজ্ঞ কুণ্ডের ধারা", শতবর্ষের স্মৃতি বিজড়িত শ্রীমঙ্গলে ডিনস্টন সিমেট্রি, মসজিদুল আউলিয়া, টি রিসোর্ট, আরোগ্য কুঞ্জ, হরিণছড়া গলফ কোর্ট, ডলু বাড়ি টিপরা পল্লী, উঁচু-নিচু পাহাড়।

ঢাকার খুব কাছে কুমিল্লায়ও ঘুরতে যেতে পারেন। এখানে রয়েছে শালবন বৌদ্ধ বিহার। বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন শালবন বৌদ্ধ বিহার কুমিল্লা জেলার কোটবাড়িতে অবস্থিত। কুমিল্লা জেলার ১২শ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত লালমাই ময়নামতি প্রত্নস্থলের অনেকগুলো প্রাচীন স্থাপনার মধ্যে বৌদ্ধ বিহার একটি। ময়নামতিতে খনন করে যতগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার ভিতরে শালবন বিহার অন্যতম। কুমিল্লা বার্ড এবং লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এ বিহারটির অবস্থান। শালবন বিহার এর নামকরণ করা হয়েছে শাল গজারির ঘন বন এর কারণে। শালবন বৌদ্ধ বিহার এর আশপাশে দর্শনীয় স্থান সমূহ, ময়নামতি জাদুঘর, ময়নামতি প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর, বিশ্বযুদ্ধের ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি, লালমাই পাহাড়, ব্লু-ওয়াটার পার্ক, কুটিলা মুড়া, ভোজ বিহার, কুমিল্লা বার্ড।

লেখক— বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক সময়ের আলো, ঢাকা এবং প্রাক্তন পরিচালনা বোর্ড সদস্য, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

CULTURE

Dancing Through the Rhythms of Tradition My Journey as a Bharatanatyam Dancer

Nritya Ratna Bipasa Sen
(Rabindra Bharati University)

Introduction: Bharatanatyam, a revered form of Indian classical dance, has been my lifelong passion and a profound source of artistic expression. Embarking on this journey as a Bharatanatyam dancer has not only enriched my life but also allowed me to delve into the depths of our cultural heritage, telling stories through graceful movements and intricate expressions.

A Dance of Devotion: Originating in the sacred temples of Southern India, Bharatanatyam is more than just a dance form—it is a spiritual experience. The intricate rituals, the hallowed halls, and the echoes of ancient hymns infuse every performance with a sense of devotion, connecting me to a tradition that spans millennia.

Mastering the Art of Abhinaya: Abhinaya, the art of expressive storytelling, is the heart of Bharatanatyam. Through subtle facial expressions and hand gestures (mudras), I strive to convey emotions, narrate tales from epics, and evoke sentiments that resonate with audiences. It is in these moments of intimate connection that the true magic of Bharatanatyam unfolds.Sculpting the Body, Perfecting the Posture: Bharatanatyam demands precision in every movement, from the arch of the eyebrow to the placement of the foot. The discipline of perfecting postures (adavus) and attaining fluidity in transitions is akin to sculpting a work of art, each movement meticulously chiseled to create a seamless visual narrative.

Melding Tradition with Innovation: While rooted in tradition, Bharatanatyam also allows for artistic interpretation. As a dancer, I find joy in exploring contemporary themes, infusing my performances with a touch of innovation while preserving the essence of classical technique. This delicate balance between tradition and evolution is what keeps Bharatanatyam relevant and dynamic.

The Symphony of Sound and Movement: The rhythmic tapestry woven by the accompanying musicians is the backbone of every Bharatanatyam performance. The resonant beats of the mridangam, the melodic strains of the flute, and the poetic verses of the vocalist create a symphony that guides my movements, bringing the performance to life in a harmonious union of sound and motion.

Embracing the Global Stage: As a Bharatanatyam dancer, I am privileged to witness the universal appeal of this ancient art form. The dance transcends borders, captivating audiences worldwide with its grace, elegance, and universal themes. It is heartening to see how Bharatanatyam has become a bridge, connecting diverse cultures through the language of movement and expression.

Conclusion: Being a Bharatanatyam dancer has been a transformative journey, one that has allowed me to delve into the rich tapestry of Indian classical arts and share its beauty with the world. Through devotion, discipline, and a commitment to preserving tradition while embracing innovation, I hope to continue contributing to the legacy of Bharatanatyam, ensuring it remains a vibrant and cherished part of our cultural heritage for generations to come.

জানা অজানা

ক্রস ডোমিনেন্স

পার্বতী দাশগুপ্তা

দু'হাতে যে সমানভাবে কাজ করতে পারে বা অস্ত্র চালনা করতে পারে তাকে সব্যসাচী বলা হয়। এই বাক্যটার সাথে আমরা সবাই খুব পরিচিত। মহাভারতে পাণ্ডব পুত্র অর্জুন সব্যসাচী নামে পরিচিত। তবে শিরোনামে উল্লিখিত Cross Dominance বা ক্রস আধিপত্য ব্যাপারটি তা থেকে আলাদা। ডোমিনেন্স (Dominance) বা প্রকটতা শব্দটির সাথেও আমরা পরিচিত এবং সেটা আমাদের বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক থেকে। প্রকটতা শব্দটি শুনলে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের মটর গাছের পরীক্ষার কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে তিনি মটর গাছের সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকট বলতে আমরা জানি যে বৈশিষ্ট্যটি অন্য একটি বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে নিজে প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্রস ডোমিনেন্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন প্রকটতার ব্যাপারটা দুটো আলাদা অঙ্গের মধ্যে আলাদাভাবে প্রকাশ পায়। যেমন এমন কিছু মানুষ আছে যারা বাঁ হাতে লিখে এবং ডান হাতে রান্না করে বা বল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনাকেই বলা হয় ক্রস ডোমিনেন্স বা ক্রস আধিপত্য। আমাদের মস্তিষ্কের বাঁ দিক সবসময় আমাদের শরীরের ডান দিককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মস্তিষ্কের ডান দিক শরীরের বাঁ দিক নিয়ন্ত্রণ করে। সে অনুযায়ী একজন ডান হাতি মানুষের সবসময় ডান পা, ডান চোখ, ডান কান ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। প্রথমে উল্লিখিত দু'হাতে সমানভাবে কাজ করতে পারাকে বলা হয় Ambidextarity, যেটা Cross Dominance থেকে আলাদা। দুটো ঘটনা একরকম নয়। Cross Dominance-কে অনেক সময় Mixed Dominance বা মিশ্র প্রকটতাও বলা হয়। কুড়ি শতাংশেরও বেশি মানুষের মধ্যে Cross Dominance দেখা যায়। চোখ এবং হাতের মধ্যের Cross Dominance খেলোয়াড় সাধারণত রাইফেল শ্যুটার এবং অ্যাথলিটের জন্য একটু সমস্যাজনক হয়। আমাদের জানা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও Cross Dominance, যেমন আমাদের প্রিয় বিশ্ববিখ্যাত শচীন তেন্ডুলকর সবসময় ডান হাতে ব্যাট, বোলিং এবং বল থ্রো করেন, কিন্তু লিখে বাঁ হাতে। আবার বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় রাফেল নাদাল বাঁ হাতে টেনিস খেলে, কিন্তু কোন কিছু লিখতে বা ছুঁড়তে ডান হাত ব্যবহার করেন। এগুলি সবই ক্রস ডোমিনেন্সের (Cross Dominance) উদাহরণ। ক্রস ডোমিনেন্স ব্যক্তিদের অনেক সময় ওদের শরীরে বিপরীত পাশে বেশি সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। যেমন— একজন ডান হাতি ব্যক্তি তার বাঁ দিকে (শরীরের) সক্রিয় থাকতে পারে। একজন ক্রস ডোমিনেন্স ব্যক্তি নিজেই বলেছেন যে পিস্তল ব্যবহার করার সময় তিনি বাঁ হাত ব্যবহার করেন কিন্তু রাইফেল চালানোর ক্ষেত্রে ডান হাত। এমন ক্রস ডোমিনেন্স কেন হয়? ২০০৯ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাধারণত আমাদের অপরিণত মস্তিষ্কের জন্যও এই ধরনের ঘটনা হয়। আবার ভারসাম্যহীন মস্তিষ্কের জন্যও হতে পারে। এই ঘটনাটা Functional Disconnection Syndrome বা FDS নামক একটা ধারণার সাথে সম্পর্কিত। এই Syndrome-এ আমাদের মস্তিষ্কের দুটো হেমিস্ফিয়ার-র মধ্যে ঠিকমত যোগাযোগ সাধিত হয় না। অনেক সময় মস্তিষ্কের একটা হেমিস্ফিয়ার যখন আরেকটা হেমিস্ফিয়ার থেকে খুব তাড়াতাড়ি গঠিত হয়ে থাকে তখনও এমন Syndrome যেটা Cross Dominance-র সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। এই ব্যাপারটাকে অনেক সময় অটিজম এবং ডিসলেক্সিয়ার (Dyslexia)ও কারণ ধরা হয়ে থাকে। বলতে গেলে একজন ক্রস ডোমিনেন্ট-র মস্তিষ্ককে এক ধরনের অপরিপূর্ণ অঙ্গ বলে অনেক সময় ধরা হয়। কিছু কিছু থিওরিতে বলা হয়েছে যে অনেক সময় করপাস ক্যালোসাম-র কম সক্রিয়তার জন্যও এরকম হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো- দ্য- ভিঞ্চির মধ্যেও ক্রস ডোমিনেন্স-র ব্যাপারটা দেখা গিয়েছিল, যদিও তা নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে এবং দুইজন বিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় পেটে রোজ এবং পিচার গ্রেগ অ্যালেন—এদের মধ্যেও ক্রস ডোমিনেন্সের ব্যাপার ছিল। এরা দু'জনেই দু'হাতে ব্যাটিং করত এবং বল থ্রো করত ডান হাতে।

>>>>><<<<<<

জানা অজানা

গণপতি প্রসঙ্গে

লক্ষ্মণ দেব

আজকাল সারা দেশের সাথে ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুয়ায়ও ব্যাপকভাবে গণেশ উৎসব পালিত হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে সাত দিনব্যাপী এই গণেশ উৎসব চলে। এই গণেশ পূজা জনপ্রিয়তার পেছনে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বালগঙ্গাধর তিলকের অবদান অবিস্মরণীয়। গণেশ পূজার মূল উদ্দেশ্য হল পরিবার, সমাজ, ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি, সুরক্ষা ও সংহতি সুনিশ্চিত থাকা।

অলৌকিক বিচারে গণেশ হলেন 'গণপতি'। 'গণ' কথার অর্থ 'সমষ্টিগত' বা 'সেনাধিপতি'। তাই জনসমষ্টির সেনাপতি ও সেনাদলের অধিপতি তিনিই শ্রী গণেশ।

জ্ঞান, ধর্ম, কাব্য, কাহিনি অনুসরণ করে অগ্রসর হলে আমরা জানতে পারি যে, অযোধ্যার রাজা দশরথ রাজ্যের দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে যখন হাহাকার উঠে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রদেবের পরামর্শে শনিদেব সম্মুখে হাজির হয়েছিলেন। তখন শনিদেব প্রসঙ্গক্রমে শ্রী গণেশের জন্মকাহিনি শুনিয়েছিলেন— কি কারণে শনির দৃষ্টিতে নবজাতক শিশু গণেশের মাথা ভস্মীভূত হল এবং শ্রী বিষ্ণু ঐরাবতের মাথা কেটে গণেশের গ্রীবাদেশে স্থাপন করে তাঁকে বাঁচালেন এবং পার্বতীর দুঃখ নিবারণ করে শ্রী বিষ্ণু বললেন 'সবার আগে গণেশ পূজা, পাছে অন্য দেবতার পূজা।'

এখানে গণেশের চারিত্রিক গুণাবলি বিশ্লেষণে জানতে পারি গণেশ ছিলেন এক অনবদ্য মাতৃভক্ত। কাহিনিতে আছে— একবার নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কার্তিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে। ঠিক হয় সাতবার বিশ্ব পরিক্রমা করে যে প্রথমে এসে মাতৃচরণ বন্দনা করতে পারবে সে বিজয়ী। তৎক্ষণাৎ কার্তিক বিদ্যুৎ বেগে বের হয়ে গেলেন বিশ্ব পরিক্রমার উদ্দেশে। অন্যদিকে বুদ্ধিতে বিচক্ষণ গণপতি ভাবলেন "মা দুর্গাইতো বিশ্বজননী"। তাঁকে পরিক্রমা করলেই হবে বিশ্ব পরিক্রমা। তাই তিনি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে মা দুর্গাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। এদিকে কার্তিক বহুকাল পরে এসে দেখতে পেলেন গণেশ বসে আছেন মায়ের পাশে। ভগবতী রায় দিয়ে বললেন "তোমাদের মধ্যে গণেশই হল বিজয়ী।"

জ্ঞানীজনেরা বলেন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে "গণ" কথার অর্থ "ইন্দ্রিয়"। এই অর্থে পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রিয় যার মধ্যে বশীভূত তিনিই হলেন 'সংকল্পের বিজয়ী'।

ঐরকমই এক ব্যক্তিত্ব 'গণপতি' বা 'শ্রী গণেশ' ভগবান শিবের মানসপুত্র।

পতঞ্জলী স্টোর্স

এখানে পতঞ্জলী এবং শ্রীশ্রী রবিশংকরজী'র সব ধরনের সামগ্রী ও ওষুধপাওয়া যায়

গান্ধীঘাট, আগরতলা

Mob: 9436129678 / 7005136242

গল্প

খেলা ভাঙার খেলা

পূর্ণোপমা রায় বর্ধন

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের দিকে হেঁটে চলেছে সাত বছরের ছেলে মানিক। মায়ের কোলে করে যাচ্ছিল তারই পাঁচ বছরের ছোট্ট বোন জ্যোৎস্না। সত্যিই পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতই তার গায়ের রঙ। মা- বাবার বড় আদরের এই জ্যোৎস্না।

কী করবে সেখানে গিয়ে তারা তা জানে না। ক্লান্ত শরীরে মা হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর গিয়ে বসে পড়লেন রাস্তার ধারে। কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নেই তাদের। বাজারে গিয়ে মানুষের সামনে হাত পেতে থাকবে কয়েকটি পয়সা পাওয়ার আশায়। কিন্তু কে দেবে পয়সা?

আজ থেকে কয়েক বছর আগে মানিক ও জ্যোৎস্নার মা মালতির বিয়ে হয়েছিল সুরেশের সঙ্গে। সুরেশ ছিল দৈনিক হাজিরার শ্রমিক। কিন্তু তাদের জন্মের পরেই অভাব যেন গ্রাস করতে লাগল সবাইকে। অভাবের তাড়নায় এবং কোনও কাজ না পেয়ে শেষে একদিন সুরেশ স্ত্রী ও তার ছেলে-মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল নিরুদ্দেশে। আর ফিরে এল না তাদের কাছে। সেই থেকে মালতি ছোট্ট মানিক ও জ্যোৎস্নাকে নিয়ে একাই আছে।

ঘর বলতে তাদের আর কিছুই রইল না। যেখানে রাত হয় সেখানেই তারা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। নিরাপত্তা বলতেও কিছুই নেই তাদের। সেই থেকে মালতি জীবন সংগ্রাম করে দুই শিশুকে নিয়ে বেঁচে আছে। এখন মালতি মানসিক ভারসাম্য হারাতে চলেছে। কী করে, কোথায় যায়, কেন শিশুদের নিয়ে হেঁটে চলে তাও জানে না সে। জ্যোৎস্না মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কখনও ঘুমিয়ে পড়ে, আবার কখনও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কখনও বা গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে।

এমনি করেই দিন যায় রাত যায় তাদের। গায়ে জড়াবার মত কোন ভালো বস্ত্রই নেই। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মালতিও আজ অর্ধ উন্মাদে পরিণত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোলের জ্যোৎস্না আর হাত ধরে থাকা মানিককে ছেড়ে মালতিও চলে গেছে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে।

মানিক এবং জ্যোৎস্না আজ পথ শিশু। অনাথ দুটি নিষ্পাপ ছেলে ও মেয়ে। তারা পথে পথে ঘুরে ও পথের দু'ধারে যা পায় নোংরা জঞ্জাল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চলে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কোথায় তাদের শৈশব কাল? কোথায় তাদের বাবা? কোথায় গেল তাদের মা? এখন তাদের আর কেউই নেই।

মানিক ও জ্যোৎস্না একটু একটু করে বড় হচ্ছে। নেই তাদের বস্ত্র, নেই বাসস্থান, নেই অন্ন, কেবলই হাহাকার। কাজ করার জন্যও কেউ তাদের রাখে না শেষে চুরি করে পালিয়ে যায় এই ভয়ে। প্রতিদিন নতুন সূর্য উঠে আবার সূর্য অস্ত যায়। কিন্তু মানিক ও জ্যোৎস্নার জন্য নেই কোনও নতুন সকাল।

মডার্ণ ক্লাবের

পক্ষ থেকে সকল রাজ্যবাসীকে

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

রাজ্যের সকল ভোক্তাদের প্রতি
ত্রিপুরা সরকারের আবেদন-

- ❖ যে কোন কেনাকাটায় রসিদ নিন। রসিদে দ্রব্যের নাম/পরিষেবার বিবরণ ও তারিখ থাকা দরকার। গ্যারান্টি/ওয়ারয্যান্টি থাকলে সেটাও বুঝে নিন।
- ❖ রেশন সামগ্রী নেওয়ার সময় e-POS মেশিনে মুদ্রিত রসিদ চেয়ে নিন এবং রসিদে উল্লেখিত দ্রব্যাদি আপনি পেয়েছেন কিনা তা যাচাই করে নিন।
- ❖ ভূয়ো এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না।
- ❖ মেয়াদকাল উত্তীর্ণ কোন জিনিস কিনবেন না।
- ❖ অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনার টেলিফোনে আসা অর্থপ্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো বার্তা বা লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না।
- ❖ আপনার এ.টি.এম কার্ডের নম্বর, মেয়াদের তারিখ ও সি.ভি.ভি নম্বর কাউকে জানাবেন না।
- ❖ ক্রেতা হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে করলে উপযুক্ত ভোক্তা কমিশনে বা ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্প লাইনে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার আদায় করে নিন। ভোক্তা কমিশনে আপনি অনলাইনেও অভিযোগ জানাতে পারেন।

সচেতন হউন: সুরক্ষিত থাকুন

ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্প লাইন	ই-ফাইলিং পোর্টাল
১৯১৫	www.edaakhil.nic.in

জাগো গ্রাহক জাগো

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

আঁকাবুকি

অদ্রিকা দত্ত (চতুর্থ শ্রেণি) শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল

দেবরাজ বিশ্বাস (দ্বিতীয় শ্রেণি) কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুল

মৃন্ময় দাস ক্লাবের জাতীয় স্তরের পুরস্কার প্রাপক

সোমালি গোস্বামী
ক্লাবের জাতীয় স্তরের পুরস্কার প্রাপক

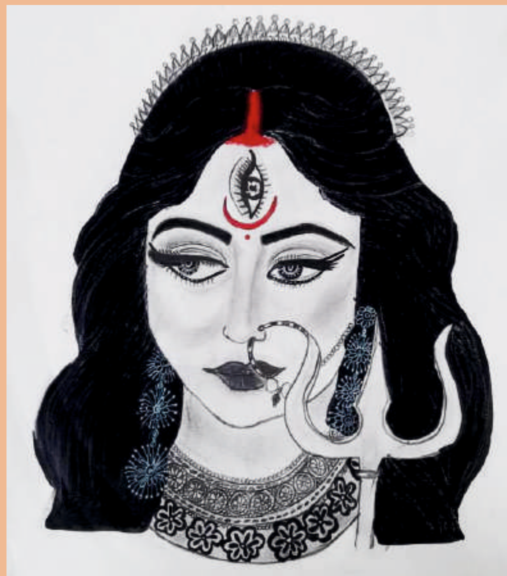

অদ্রিতা সেন (পঞ্চম শ্রেণি) হলিক্রস স্কুল

অদ্রিজা দত্ত (অষ্টম শ্রেণি) শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল

রিদ্ধিতা ঘোষ (চতুর্থ শ্রেণি) হলিক্রস স্কুল

আদিরাজ দে (পঞ্চম শ্রেণি) শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল

অলয়শংকর চক্রবর্তী (তৃতীয় শ্রেণি)
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

দেবাজ্ঞ ভৌমিক (পঞ্চম শ্রেণি) হলিক্রস স্কুল

শ্রেষ্ঠা দত্তবণিক ক্লাবের জাতীয় স্তরের পুরস্কার প্রাপক

খেলা

স্বপ্নে ২০২৬ এশিয়ান গেমস

অলক ঘোষ

চ্যালেঞ্জ নেওয়া হয়েছিল ইতিহাস গড়ার। এশিয়ান গেমসের ৭৩ বছরের ইতিহাসে যা হয়নি তা হবে চীনের বুকেই। কথা দিয়ে সেই কথাই কিন্তু রাখলেন এ দেশের ক্রীড়াবিদরা। চীনের বুকেই এশিয়ান গেমসে ইতিহাস গড়ল ভারত। এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে প্রথমবার পদক জয়ে সেঞ্চুরি করল ভারত। কাবাডিতে মহিলারা সোনা জেতার সাথে সাথে পদক তালিকায় ভারতের ঘরে জমা পড়ল মোট একশটি পদক। তবে গেমস যখন শেষ হলো ততক্ষণে ভারতের ঘরে জমা পড়ে গেছে ১০৭ টি পদক। যার মধ্যে সোনা ২৮ টি, রূপা ৩৮ টি ও ব্রোঞ্জ পদক ৪১ টি।

১৯৫১ সালে দিল্লিতে শুরু আধুনিক এশিয়ান গেমসের। এতদিন ২০১৮ জাকার্তা গেমসে পদক জয়ের রেকর্ড ছিল ভারতের। জাকার্তা গেমসে ভারতের দখলে ছিল ৭০ টি পদক। যার মধ্যে সোনা ১৬ টি, রূপো ২৩ টি এবং ব্রোঞ্জ ৩১ টি। এবার চীনের বুকে সেই রেকর্ড ভাঙল। অবশ্য এবারের গেমসে ইভেন্টের সংখ্যা বেশি ছিল। যার মধ্যে অন্যতম ক্রিকেটে ভারতের অংশগ্রহণ এবং জোড়া সোনা। পুরুষদের হকিতেও সোনা জিতল ভারত। ২০২৩ চীন (হানঝাউ) গেমসে ভারতীয় দলে ছিলেন মোট ৬৬১ জন অ্যাথলেট। তাদের মধ্যে পুরুষ ৩৩৫ জন এবং মহিলা ৩২৬ জন। তবে দুর্ভাগ্য ত্রিপুরার। রাজ্যের কোন ক্রীড়াবিদ কিন্তু ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র তুলে নিতে পারেনি। তবে মন্দের ভালো রাজ্যের একজন ভারতীয় পুরুষ ব্রিজ দলের কোচ ছিলেন।

এবারের গেমসে সবচেয়ে বেশি পদক এসেছে অ্যাথলেটিক্স থেকে। তারপর শুটিং, তিরন্দাজি। এশিয়ান গেমসে ২৮ খানা সোনা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে এক বড় মাইলস্টোন। নিশ্চিতভাবে বলা চলে স্বাধীন ভারতের সেরা সাফল্য এবারের এশিয়ান গেমস। দেশ এক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে। পকদ সংখ্যা বাড়ছে, তা অবশ্যই গর্বের বিষয়। কিন্তু পদক জয়ে ভারত সেঞ্চুরি করলেও ত্রিপুরার একজনও কিন্তু ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ পায়নি। অবশ্য দীপা কর্মকার ছাড়া এ রাজ্যের জাতীয় ক্ষেত্রে সাফল্যের ক্রীড়াবিদ কোথায়?

বাম আমলে আধুনিক এনএসআরসিসি গড়ে তোলার পর মনে হয়েছিল যে, জিমন্যাস্টিক-এ ভারতবর্ষে রাজত্ব করবে ত্রিপুরা। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাতে তো অন্য চেহারা দেখা যাচ্ছে। কাউকে নির্দিষ্টভাবে দোষারোপ না করেই বলতে হচ্ছে দেশ পরিকল্পনা করে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিপ্লব আনার চেষ্টা করলেও ত্রিপুরা যেন ব্যতিক্রম।

এরাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে বাজেট কত? ১০ বছরে ক্রীড়া দপ্তরে ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ নেই। স্ব-শাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির সরকারি অনুদান প্রায় শূন্যের কোঠায়। কেন্দ্রও যে ক্রীড়া উন্নয়নে ত্রিপুরার জন্য উদার বা বিশেষ উদ্যোগী তা বলা যাবে না। একমাত্র স্যাগ সেন্টারটিরও সমস্যার শেষ নেই।

গত ৬ বছরে হাতে গোনা কয়েকটি সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ ছাড়া প্রাপ্তি তো শূন্য। দীপা ছাড়া ভারতীয় দলের হয়ে খেলার মতো কেউ কেন তৈরি হয়নি? আর দীপার ইনিংসও তো শেষ। এশিয়ান গেমসে এত সাফল্যের মধ্যেও মনে প্রশ্ন জাগে যে, ত্রিপুরা কেন পারেনি চীনে একজনও ক্রীড়াবিদকে পাঠাতে? তবে এই সময়ে প্রয়োজন লম্বা সময়ের পরিকল্পনা। যোগ্য লোকদের ক্রীড়াক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া, আর সরকারি উদ্যোগে গোটা রাজ্যে ক্রীড়া বিপ্লব দরকার। যাতে ২০২৩ না হলেও ২০২৬ জাপান গেমসে ভারতীয় দলের জার্সি পরে মাঠে নামতে পারে ত্রিপুরার কেউ। এখন থেকেই বাস্তবে স্বপ্ন দেখা শুরু করলে এই স্বপ্ন পূরণ হতে কিন্তু বাধ্য।

এশিয়ান গেইমস ও ভারত

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

খেলা

এশিয়ান গেইমস— এই কথাটির অর্থ হল এশিয়া মহাদেশের সমস্ত দেশগুলি নিয়ে একটি বৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ ওলিম্পিকের পরই একটি বৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই এশিয়ান গেইমসের সূচনা করে প্রথম ভারত ১৯৫১ সালে দিল্লিতে। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ভারত ১৯৮২ সালে দিল্লিতে দ্বিতীয়বারের জন্য এই ক্রীড়ার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের এশিয়ান গেইমসের আয়োজন করে চীন। চীনের হাউঝো শহরে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন হয় ২৩ শে সেপ্টেম্বর। যদিও এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল ২০২২ সালে। কোভিডের কারণে তা এক বছর পিছিয়ে যায়। চীন বরাবর এশিয়ান গেইমসে অনান্য দেশগুলি থেকে পদক তালিকার অনেক উপরের সারিতে থাকে। ২০১৮-য় এশিয়ান গেইমসে ভারত সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছিলো। ২০২৩ সালে ভারত মোট ১০৭টি পদক পেয়েছে। এশিয়ান গেইমসে এবারই সবচেয়ে বেশি পদক পেল ভারত।

এশিয়ান গেমস

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রূপা	ব্রোঞ্জ	মোট
১ম	চীন	২০১	১১১	৭১	৩৮৩
২য়	জাপান	৫২	৬৭	৬৯	১৮৮
৩য়	দক্ষিণ কোরিয়া	৪২	৫৯	৮৯	১৯০
৪র্থ	**ভারত**	২৮	৩৮	৪১	১০৭

২০২৩ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ক্রিয়েটিভ লেন্স

বিপ্লব চন্দ

দুটি উৎসবের দামামা বেজে গেছে একসাথে। একই মাসে দুটি উৎসব। একদিকে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। আর অন্যদিকে ক্রিকেট প্রেমীদের মহৎ উৎসব বিশ্বকাপ ক্রিকেট। গোটা অক্টোবর মাসজুড়ে আকাশ বাতাস আলোড়িত রঙিন আলোতে। তবে ভারতে এবার ১৩তম বিশ্ব ক্রিকেটের মহা উৎসবের কারণে বাড়তি উন্মাদনা প্রত্যেকের মধ্যে। ৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর, ৪৬দিন ব্যাপী এই আসরের কিছু "ক্রিয়েটিভ লেন্স" তুলে ধরা হল এখানে।

১) ভারতে এই নিয়ে বিশ্বকাপ হচ্ছে চতুর্থবার।

২) ICC-র ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ২০২৩ এর আসর ১৩তম আসর।

৩) ২০২৩ বিশ্বকাপে রাউন্ড রবিন লিগ ও পরে হচ্ছে নক-আউট।

৪) অংশগ্রহণকারী ১০ দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলছে।

৫) রাউন্ড রবিন লিগে সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহকারী ৪টি দল খেলবে সেমিফাইনাল।

৬) সেমিফাইনালের সেরা ২টি দল খেলবে ফাইনাল।

৭) ২০২৩ সাল পর্যন্তই ১০টি দল খেলছে বিশ্বকাপ।

৮) ২০২৭ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দলের সংখ্যা বেড়ে হবে ১৪টি।

৯) ২০২৩ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী ম্যাচ ও ফাইনাল ম্যাচ হবে একই মাঠে। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

১০) এবারে বিশ্বকাপে ম্যাসকট দু-জন। "ক্রিক্টোভার্স" নামের একটি ছেলে ও মেয়ে।

১১) বিশ্বকাপের ৪৮টি ম্যাচ হবে ৪৬ দিনে ১০টি স্থানের ১০টি স্টেডিয়ামে।

১২) ২০২৩ সালে ১৩তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজ মানি প্রায় ৩৪ কোটি টাকা। রানার্স দল পাবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা। সেমি ফাইনালের দলগুলি পাবে প্রায় ৬ কোটি টাকা। তাই, এবার শেষ হাসির দিকে তাকিয়ে গোটা ক্রিকেট দুনিয়া।

খেলা

এক যুগের প্রতীক্ষার অবসান

সরযূ চক্রবর্তী

দীর্ঘ এক যুগের প্রতীক্ষার অবসান হল। ১২ বছর পর ফের ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে ভারতের মাটিতে। এবারই প্রথম এককভাবে ভারত আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজক। এর আগে যে তিনবার ভারতের মাটিতে আসর হয়েছিল এতে এশিয়ার অন্য দেশগুলির সাথে ভারত ছিল যৌথ আয়োজক।

এই প্রতিবেদনটি যখন আপনারা পড়বেন, বিশ্বকাপের অভিযান এর আগেই শুরু হয়ে যাবে। ভারতসহ আসরে লড়াইয়ে থাকা বিভিন্ন দেশগুলির বেশ কিছু ম্যাচও হয়ে যাবে। তবে সেটা শুরুর দিকে। ৪৫ দিনের এই মেগা যুদ্ধের অবসান হবে আগামী ১৯ নভেম্বর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে আয়োজক এবং নিয়ন্ত্রকের ধারাতে ৪০ বছর আগে জোর ধাক্কা দিয়েছিল ভারতই। ধাক্কাটা এতোই জোরে হয়েছিল যে এর রাশ কুক্ষিগত করে রাখা ব্রিটিশরা আর টেনে রাখতে পারেননি। মুঠো ছেড়ে বেরিয়ে যায় সেই ১৯৮৩ সালে। ঐতিহাসিক লর্ডসের বিজয়গাঁথা আজও অমলিন ক্রিকেট বিশ্বের কাছে। এর আগের দুটি আসরের চ্যাম্পিয়ন তথা ক্রিকেট বিশ্বের বাদশা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতা ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধন করে বিশ্ব ক্রিকেটকে সমান্তরালে এনে দাঁড় করান কপিল দেব নিখাঞ্জের ভারত। আর এই একটা মিরাকেল গোটা বিশ্বের সামনে দরজা খুলে দেয় মাথা তুলে দাঁড়ানোর।

ব্রিটিশদের তালুতে বন্দি থাকা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজনের একচ্ছত্র অধিপত্যে আসে জোর ধাক্কা। এর সাথে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলেও (আইসিসি) আসে নতুনের ডাক। সেই সময়ে বিবর্তনের ইতিহাস গড়েন প্রখ্যাত ক্রিকেট প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়া (জগুদা)। চার বছর পর ১৯৮৭ সালে এশিয়া মহাদেশে তিন দেশ হয় বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক। পরবর্তী সময়ে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজও আয়োজকের দায়িত্ব পায়। ক্রিকেটের বিশ্বকাপের আয়োজনে বিশাল পরিবর্তন আসে। ১৯৮৭ সালের পর ভারতের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয়বার, ২০১১ সালে তৃতীয়বার যৌথ আয়োজন হয়। এবার এককভাবে প্রথমবার আয়োজক ভারত।

ইতিহাসের পাতায় ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের সাফল্যের ধারা মিশ্র বলা চলে। ১৯৮৩ সালে ইংল্যান্ডে ভারতীয় তেরঙ্গা প্রথম উড়েছিল। এরপর গড়িয়ে যায় ২৮ বছর। দ্বিতীয়বার মহেন্দ্র সিং ধোনির হাত ধরে কাপ দখলের সোনালি গাঁথা রচিত হয় ২০১১ সালে ঘরের মাটিতে। মাঝে সৌরভ গাঙ্গুলির টিম ইন্ডিয়া ফাইন্যালে উঠলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আসরে কাপ দখলের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। ফাইন্যালে পৌঁছেও দাদা দেশকে কাপ এনে দিতে পারেননি। দাদার সাথে কাপ না পাওয়ার বিশাল আফশোস ছিল বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি ব্যাটার শচীন তেন্ডুলকরের। যা তিনি পুষিয়ে নেন ২০১১ সালে। এবার আবার ইতিহাসের সোনালি মাইলফলক তৈরি করার মত সুযোগ ভারতের রয়েছে। হয় কিনা, সেটা সময়ই বলবে।

বর্তমান সময়ে ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করার সব রসদ রয়েছে ভারতের। কিন্তু সাফ কথা যদি বলা হয়, সেটা হল ধারাবাহিকতার অভাব। এক্ষেত্রে সামান্য হলেও সংশয় রয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিং লাইনআপ, অসাধারণ বোলিং বিভাগ, একাধিক ম্যাচ উইনারের সমাহার - সবই রয়েছে দলে। এর পরেও ২০১১ সালের ধোনির টিম ইন্ডিয়া যতটা ভরসা রেখে দেশকে কাপ দিয়েছিল, এবারের দলে সব থেকেও ভরসাটা সেই জায়গায় নেই। আর তাই "কাপ ভারতেরই" ততটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। একেকটা করে ম্যাচ নিয়ে ভাবনা এবং লক্ষ্য পূরণের যে কাহিনি ধোনি গড়েছেন, রোহিত কি সেই কাহিনির সর্বশেষ সংযোজনে ভারতের নাম জুড়তে পারবেন? আসুন অপেক্ষা করি এবং অবশ্যই বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি উপভোগ করি সেই আশা নিয়ে।

মডার্ণ ক্লাবের কার্যকরি কমিটি- ২০২৩

সভাপতি ঃ শ্রী সজল চক্রবর্তী
সহ-সভাপতি ঃ শ্রী সমর রায়, শ্রী স্বপন দত্ত
সম্পাদক ঃ শ্রী সঞ্জিত নাহা (লিটন)
সহ-সম্পাদক ঃ শ্রী দেবব্রত ভৌমিক, শ্রী দেবারুণ দত্ত
কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রী তপন রক্ষিত
সহ-কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রী পার্শ্বনাথ ধর
সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস দেব
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ শ্রী রাণা সাহা
ক্রীড়া সম্পাদক ঃ শ্রী প্রণব পোদ্দার
প্রচার সম্পাদক ঃ শ্রী মিন্টু দেব
অফিস সম্পাদক ঃ শ্রী উত্তম ধর

কার্যকরি কমিটির সদস্য

শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী আশিস রায়
শ্রী রামকৃষ্ণ বণিক
শ্রী পার্থ চক্রবর্তী
শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
শ্রী চন্দন কর
শ্রী অলক চক্রবর্তী
শ্রী অলক দে
শ্রী বিদ্যুৎ সেন
শ্রী বাপী দত্ত
শ্রী পার্থ সারথি দেব
শ্রী জয়ন্ত ভদ্র
শ্রী নিতাই পাল

উপদেষ্টা কমিটি

শ্রী মিহির চক্রবর্তী
শ্রী মৃণালকান্তি দেবরায়
শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী হিমাদ্রী সাহা
শ্রী স্বরাজ দেব
শ্রী শেখর সি দত্ত
শ্রী গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী
শ্রী ফণীন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীমতী স্বপ্না দাশগুপ্তা
শ্রী রতন দেব
শ্রী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
শ্রী অপু বিশ্বাস
শ্রী গোপাল দত্ত
শ্রী বিদ্যুৎ চৌধুরী
ড: জয়ন্ত পাল
ডা:বাসুদেব রায়
শ্রীমতী শিপ্রা রায়
শ্রীমতী কনিকা চক্রবর্তী
শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী
শ্রী উত্তম রায়
শ্রী অসীম বিশ্বাস
শ্রী প্রদ্যুৎ সেন
ডা: মণিদীপ চক্রবর্তী
শ্রী পান্নালাল চক্রবর্তী
শ্রী সন্তোষ ঘোষ
শ্রীমতী মিতা চক্রবর্তী
শ্রী সুব্রত ভৌমিক

দুর্গা পূজা কমিটি- ২০২৩

সভাপতি ঃ শ্রী দেবজিৎ বিশ্বাস
সহ-সভাপতি ঃ শ্রী পান্নালাল চক্রবর্তী
শ্রী সুব্রত ভৌমিক
শ্রী অসীম বিশ্বাস
শ্রী প্রদ্যুৎ সেন
শ্রীমতী স্বপ্না দাশগুপ্তা
সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস দেব
সহ-সম্পাদক ঃ শ্রী জয়ন্ত ভদ্র
শ্রী নিতাই পাল
শ্রী ধৃতিমান চক্রবর্তী
শ্রীমতী রুমা দে
শ্রী মনোজ দেব
শ্রী অপূর্ব দত্ত
কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রী চন্দন কর
সহ-কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রী দেবারুণ দত্ত
সদস্য ঃ শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
শ্রী উত্তম রায়
শ্রী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
শ্রী অলক চক্রবর্তী
শ্রী অলক দে
শ্রী বাপী দত্ত
শ্রী দেবব্রত ভৌমিক
শ্রী উত্তম ধর
শ্রী পার্শ্বনাথ ধর
শ্রী মিন্টু দেব
শ্রী পিনাক চক্রবর্তী
শ্রী রানা সাহা
শ্রী দীপঙ্কর রায়
শ্রী প্রণব পোদ্দার
শ্রী শুভঙ্কর দেব
শ্রী শুভঙ্কর ভট্টাচার্য
সদস্যা ঃ শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী
শ্রীমতী রীতা দেবরায়
শ্রীমতী শিপ্রা রায়
শ্রীমতী অঞ্জনা চক্রবর্তী
শ্রীমতী মিতা চক্রবর্তী
শ্রীমতী রিনা কপালী
শ্রীমতী শিল্পী মজুমদার (ধর)
শ্রীমতী বেলা দেব
শ্রীমতী সন্ধ্যা পাল
শ্রীমতী দেবপ্রিয়া বণিক (দত্ত)
শ্রীমতী লক্ষ্মী চৌধুরী (দত্ত)
শ্রীমতী অদিতি চক্রবর্তী
শ্রীমতী রূপা বৈদ্য
শ্রীমতী সোমা দত্ত

ICICI Bank Ltd

We Wish All The Residents Of Bhattapukur,Agartala
A Prosperous Durga Puja

SERVICE

1. Savings & Curent A/C
2. Flexi FD
3. Demat Account
4. Online Banking
5. Wealth Account
6. Corporate Account
7. Other Various Services

VARIOUS LOAN SCHEMES

1. Home Loan
2. Lap(Loan Against Property)
3. Personal Loan
4. Business Loan
5. Gold Loan
6. Car Loan
7. CC Loan

Conatct :
Mr. Abhijit Ghosh
Branch Manager
ICICI Bank
Badharghat Branch
M : 9366365138

Conatct :
Mr. Subhranil Das
Relationship Manager
ICICI Bank
Badharghat Branch
M : 9233154020

আটলান্টার চৌধুরী পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই
দুর্গা পুজোর
প্রীতি ও
শুভেচ্ছা
পুজোর দিনগুলো হোক
আনন্দময় ও নিরাপদ।
- জবা চৌধুরী (চক্রবর্ত্তী)